বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, চুয়াল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩/জুন ২০২৬
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v44i.001

বাংলা লোকভাষাবিজ্ঞান চর্চার প্রেক্ষাপট, ইতিহাস ও প্রবণতা

জফির সেতু*

সারসংক্ষেপ

বাংলা ভাষাঅঞ্চলে লোকভাষাবিজ্ঞান বা Folk-linguistics চর্চার উদ্ভব, বিকাশ, তাত্ত্বিক পরিকাঠামো ও বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা নেই বললেই চলে। ইউরোপ-আমেরিকায় বিশ শতকের ষাট-সত্তরের দশকে সমাজভাষাবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান ও সংস্কৃতি অধ্যয়নের সমান্তরাল লোকভাষাবিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র বিদ্যা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে; এর অল্পকাল পরে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে আশির দশক থেকে এ চর্চার সূচনা ঘটে। গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে বাংলা লোকভাষাবিজ্ঞান মূলত ভাষাতত্ত্ব, লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি চর্চার ধারাবাহিকতায় বিকশিত হয় এবং প্রাথমিক পর্যায়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক ও তথ্যসংগ্রহনির্ভর হলেও পরবর্তীকালে তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত বৈচিত্র্য অর্জন করে। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে উনিশ শতকের ভাষাতাত্ত্বিক বিতর্ক, আঞ্চলিক ভাষার মূল্যায়ন, সাধু-চলিত ভাষা বিতর্ক, এবং সামাজিক শ্রেণি ও লিঙ্গভিত্তিক ভাষা-ব্যবহারের প্রশ্নকে লোকভাষাবৈজ্ঞানিক অনুষঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পাশাপাশি বিশ শতকে উপভাষা-সমীক্ষা ও বিভিন্ন গবেষণায় লোকভাষার উপাদানসমূহ ক্রমে গুরুত্ব পেয়েছে। সত্তর দশক থেকে লোকভাষাবিজ্ঞান তাত্ত্বিক ভিত্তি পেতে শুরু করে এবং পরবর্তীকালে বহুমাত্রিক গবেষণা-প্রক্রিয়া গড়ে ওঠে। সার্বিকভাবে গবেষণাটি নির্দেশ করে যে বাংলা লোকভাষাবিজ্ঞান এখনো একটি বিকাশমান বিদ্যা; প্রাতিষ্ঠানিক ঘাটতি, গবেষণা-সুবিধার অভাব ও তাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষেত্রটির সম্ভাবনা ব্যাপক। এ-প্রবন্ধে মূলত লোকভাষাবিজ্ঞান চর্চার প্রেক্ষাপট, ইতিহাস ও প্রবণতার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

চাবি শব্দ : লোকভাষাবিজ্ঞান, ইতিহাস, জনভাষা, লোকসংস্কৃতি, শিষ্টভাষা।

প্রাক্‌কথন

'Folk-linguistics' বা 'লোকভাষাবিজ্ঞান' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন পোলান্ডে জন্মগ্রহণকারী জার্মান-আমেরিকান পণ্ডিত ও সমাজভাষাবিজ্ঞানী হেনরি হেনিগ্‌সোয়াল্ড ১৯৬৪ সালে।[১] লস অ্যানজেলেসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সমাজভাষাবিজ্ঞান-সংক্রান্ত কনফারেন্সে এ-বিষয়ে তিনি অনুসন্ধানের প্রস্তাব করেন এবং ১৯৬৬ সালে 'A proposal for the study of folk-linguistics' শিরোনামে প্রবন্ধ-উপস্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে নব-উদ্ভূত শাখার অভিষেক ঘটান।[২] পরবর্তীকালে সমাজভাষাবিজ্ঞান, নৃভাষাবিজ্ঞান, কিংবা সংস্কৃতি অধ্যয়ন বিদ্যায় সমান্তরালভাবে জ্ঞানচর্চার এই শাখা জনপ্রিয় হতে থাকে এবং তত্ত্বগত দিক থেকে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। তবে 'Folk Linguistics' শব্দটি ব্যবহারের সূচনাকাল থেকে পরিভাষা-বিষয়ক সমস্যার সম্মুখীন

---

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

হয়। শব্দটা নেওয়া হয়েছে ইংরেজি Folk Language থেকে এবং তার মূলে রয়েছে জার্মান ‘Volksprache’ শব্দের অনুবাদ। জার্মান ভাষায় ‘উপভাষা’ অর্থে শব্দটির ব্যবহার রয়েছে। যদিও হেনরি হেনিগ্‌সোয়াল্ড ‘উপভাষা’ বা ‘আঞ্চলিক ভাষা’ অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেননি।

ভাষাপ্রকাশের সামাজিক দিক বিবেচনা করে ম্যাক্ ডেভিড (১৯১১-১৯৮৪), হেনরি এ. গ্লিসন (১৯১৭-২০০৭) প্রমুখ সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা যে-কোনো ভাষার তিনটি স্তরকে চিহ্নিত করেছেন, যথা—শিষ্টভাষা, জনভাষা ও লোকভাষা।[৩] Folk speech বলতে তাঁরা বুঝিয়েছেন বিভিন্ন কারণে বিচ্ছিন্ন কিন্তু সংহত গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা কৌমজনের ভাষা—যা নানা কারণেই ক্রম-ক্ষয়িষ্ণু। জার্মানে ‘Volksprache’ শব্দের অর্থ মূলত ‘উপভাষা’ হলেও পশ্চিমা দেশগুলোতে সাধারণভাবে এর অর্থ ‘গেঁয়ো ভাষা’, অর্থাৎ যা অ-নাগরিক বা অমার্জিত কিংবা যা মান ভাষা নয়। আবার হেনরি হেনিগ্‌সোয়াল্ডের `Folk-linguistics’ অর্থে অনেকে ‘লৌকিক ভাষাতত্ত্ব’ বুঝেছেন।[৪] কেউ-বা আবার ‘লোকভাষা’ অর্থে লোকসাহিত্যের ভাষাকেও বুঝেছেন।[৫] অর্থাৎ নানা বিতর্ক সত্ত্বেও লোকভাষাবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক রূপ পরিগ্রহকালে লোকভাষার সংজ্ঞার্থ কিংবা লোকভাষাবিজ্ঞানের বিষয় ও পরিধি নির্ধারিত হয়। তাতে দেখা যায় লোকভাষা যেমন আঞ্চলিক ভাষা নয়, তেমনি নয় এটি উপভাষাও। উপভাষার সঙ্গে লোকভাষার প্রধান পার্থক্য হচ্ছে যে, উপভাষায় দ্বিবাচনিক বা মিশ্রবাচনিক বৈশিষ্ট্য সর্বাত্মক হলেও লোকভাষায় তা নগণ্য কিংবা নেই বললে চলে। এই পরিপ্রেক্ষিতে লোকভাষার স্বরূপবৈশিষ্ট্য আবিষ্কার, বর্ণনা ও বিশ্লেষণ লোকভাষাবিজ্ঞানের বিষয় হয়ে ওঠে। এছাড়া ভাষাবৈচিত্র্য অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও বর্ণনা; লোকপরম্পরা ও ঐতিহ্যসূত্রের সঙ্গে ভাষাসূত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক আবিষ্কার; মানুষের বিশ্বাস, যাপিত জীবন, লোকসংস্কৃতি ও লোকায়ত জীবনের সঙ্গে ভাষার যুক্ততা; ভিন্ন ভাষাসংযোগ, ভিন্ন লোকভাষা সংযোগ ও শিষ্টভাষা সংযোগে লোকভাষার মিশ্রণের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ লোকভাষাবিজ্ঞানের আওতাভুক্ত। বাংলাভাষী সমাজে ভাষা সম্পর্কে নানা লোকবিশ্বাস, শব্দের উৎপত্তি নিয়ে জনমত, আঞ্চলিক ভাষার মর্যাদা-বিষয়ক ধারণা, প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, লোকসাহিত্য ও মৌখিক ঐতিহ্যের মধ্যে ভাষা-সম্পর্কিত বিপুল উপাদান বিদ্যমান। কিন্তু বাংলা ভাষাবিজ্ঞানের মূলধারার গবেষণায় এই ক্ষেত্রটি এখনও পর্যাপ্ত গুরুত্ব পায়নি। তাই বাংলা লোকভাষাবিজ্ঞান চর্চার প্রেক্ষাপট, ঐতিহাসিক বিকাশ এবং বর্তমান প্রবণতাকে সমন্বিতভাবে বিশ্লেষণ করলে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি গবেষণায় একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে। সেই বিবেচনায় গবেষণাপত্রটি রচিত হয়েছে।

গবেষণা-সমস্যার বিবৃতি

বাংলা ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান, সমাজভাষাবিজ্ঞান, উপভাষাতত্ত্বসহ ভাষাবিজ্ঞানের অপরাপর আধুনিক শাখায় অনেক কাজ হলেও লোকভাষাবিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে ধারাবাহিক ও তাত্ত্বিক গবেষণা তুলনামূলকভাবে কম। বাংলা ভাষা সম্পর্কে লোকসমাজের ধারণা, ভাষা-সম্পর্কিত বিশ্বাস; উপভাষা, আঞ্চলিক ভাষা ও লোকভাষার সম্পর্কসূত্র তথা বৈশিষ্ট্য, আঞ্চলিক ভাষা ও মানভাষার সম্পর্ক, গ্রাম্য ভাষা ও অধোমান্য ভাষার সম্পর্ক, লোকসাহিত্য ও লোকভাষার সম্পর্ক, লোকসংস্কার ও লোকসংস্কৃতির সঙ্গে ভাষার যোগাযোগ, লোকনিরুক্তি এবং ভাষাগত মনোভঙ্গি

প্রভৃতি নিয়ে বিচ্ছিন্ন গবেষণা থাকলেও এ সংক্রান্ত চর্চার সামগ্রিক ইতিহাস ও প্রবণতামূলক বিশ্লেষণ অনুপস্থিত বললেই চলে। ফলে বাংলা লোকভাষাবিজ্ঞান চর্চার প্রকৃতি, বিকাশ ও বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠেনি।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান প্রশ্ন ছিল– বাংলা লোকভাষাবিজ্ঞান চর্চার প্রেক্ষাপট ও ইতিহাস কী? এছাড়াও এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলা লোকভাষাবিজ্ঞান চর্চার প্রেক্ষাপট, ইতিহাস এবং প্রবণতা অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা। বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল লোকভাষাবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ধারণা ও পরিসর নির্ধারণ; বাংলা ভাষায় লোকভাষাবিজ্ঞান চর্চার ঐতিহাসিক সূত্র ও বিকাশ অনুসন্ধান; লোকসাহিত্য, লোকসংস্কৃতি, উপভাষা, প্রবাদ-প্রবচন ও ভাষা-সম্পর্কিত ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান শনাক্ত করা; বাংলা ভাষাবিজ্ঞান গবেষণায় লোকভাষাবিজ্ঞানের অবস্থান ও অবদান মূল্যায়ন এবং সমকালীন বাংলা লোকভাষাবিজ্ঞান গবেষণার প্রধান প্রবণতা ও সম্ভাবনা নিরূপণ করা।

গবেষণা-প্রশ্ন

কয়েকটি বিশেষ প্রশ্ন সামনে রেখে গবেষণাটি সম্পন্ন হয়েছে। গবেষণা-প্রশ্নগুলো হচ্ছে ১) লোকভাষাবিজ্ঞান কী এবং এর তাত্ত্বিক ভিত্তি কী?; ২) বাংলা ভাষায় লোকভাষাবিজ্ঞান চর্চার সূচনা ও বিকাশ কীভাবে ঘটেছে?; ৩) বাংলা লোকসমাজে ভাষা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা ও বিশ্বাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?; ৪) বাংলা ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে লোকভাষাবিজ্ঞান কী ধরনের অবদান রেখেছে? এবং ৫) বর্তমান সময়ে বাংলা লোকভাষাবিজ্ঞান গবেষণার প্রধান প্রবণতা ও চ্যালেঞ্জ কী?

গবেষণা-পদ্ধতি

'বাংলা লোকভাষাবিজ্ঞান চর্চার প্রেক্ষাপট, ইতিহাস ও প্রবণতা'-শীর্ষক গবেষণা-প্রবন্ধে জাতিসত্তা, জাতীয় ভাষা, উপভাষা, লোকভাষা, লোকসংস্কৃতি, লোকসাহিত্য, সমাজ-সংস্কৃতি প্রভৃতি পর্যালোচনার জন্য ইতিহাসবিদ, নৃবিজ্ঞানী, ভাষাবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের রচিত গ্রন্থপর্যালোচনা ছাড়াও এই গবেষণা মূলত তিনটি ধাপে সম্পন্ন করা হয়। ধাপগুলো হচ্ছে পর্যায়ক্রমে (ক) সাহিত্য পর্যালোচনা; (খ) তত্ত্ব-উপাত্ত সংগ্রহ এবং (গ) উপাত্ত বিশ্লেষণ। গবেষণায় তত্ত্ব-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে নিম্নলিখিত দুটি উৎস থেকে : (ক) প্রাথমিক উৎস ও (খ) দ্বৈতীয়িক উৎস।

প্রাথমিক উৎস : বাংলা লোকভাষাবিজ্ঞান নিয়ে এযাবৎকালে যেসব চর্চা হয়েছে অর্থাৎ প্রাথমিক উপাত্ত/উপাদান হিসেবে ভাষাবিজ্ঞানী/গবেষকদের যেসব প্রবন্ধ, গ্রন্থ ও গবেষণাপত্র বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে তা অনুসন্ধান করে সংগ্রহ করা হয়েছে। যেসব গবেষণা অভিসন্দর্ভ/গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়নি তাও বিভিন্ন সংগ্রহশালা, আর্কাইভস্ কিংবা ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে প্রাথমিক উপাত্ত হিসেবে সংগৃহীত হয়েছে। একইসঙ্গে বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন বিজ্ঞানী ও গবেষকের কাছ থেকে পারিভাষিক শব্দ ক্ষেত্রকর্মের মাধ্যমে সংগ্রাহক কর্তৃক সংগৃহীত

হয়েছে। একই সঙ্গে ভাষাবিজ্ঞানী ও গবেষকদের সঙ্গে আলাপচারিতা/সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

দ্বৈতীয়িক উৎস : দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি, ফোকলোর, সমাজভাষা, উপভাষা ও লোকভাষা-বিষয়ক প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ/নিবন্ধ ও আলোচনা, গ্রন্থ, রিপোর্ট, সেমিনারপত্র, সুপারিশপত্র, সংকলন, জরিপ প্রতিবেদন, আদমশুমারি রিপোর্ট, গেজেটিয়ার্স, অভিসন্দর্ভ, ওয়েবসাইড প্রভৃতি। লোকভাষাবিজ্ঞান নিয়ে সারাবিশ্বে নানা তত্ত্ব ও আলোচনা রয়েছে; সে-সংক্রান্ত গ্রন্থও উপাত্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে।

প্রাপ্ত প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উপাদান/ভাষাতথ্য-উপাত্ত যাচাই-বাছাইপূর্বক অনুধাবন, পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তও পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রধানত বর্ণনামূলক পদ্ধতিই অনুসৃত হয়েছে। অপরদিকে বাংলাদেশ ও ভারতের বাংলাভাষী অঞ্চলের ভাষাবিজ্ঞানীদের লোকভাষাবিজ্ঞান-চর্চার প্রেক্ষাপট ও ইতিহাস আলোচনা ও বিশ্লেষণে তুলনামূলক পদ্ধতিও প্রয়োগ করা হয়েছে। সার্বিক তথ্য ও তত্ত্ব প্রয়োগে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিও অনুসরণ করা হয়েছে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

গবেষণাটি বাংলা লোকভাষাবিজ্ঞান চর্চার প্রেক্ষাপট, ইতিহাস ও প্রবণতা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হলেও এর কিছু স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা ছিল। প্রথমত, বাংলা লোকভাষাবিজ্ঞান একটি তুলনামূলকভাবে নবীন ও স্বল্প-অনুসন্ধানকৃত ক্ষেত্র হওয়ায় এ-সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ গবেষণা, তাত্ত্বিক গ্রন্থ এবং নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র সীমিত। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসাম মূলত বাংলাভাষী অঞ্চল। এসব অঞ্চলেই ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে লোকভাষাবিজ্ঞান চর্চিত হয়ে আসছে। গবেষকের পক্ষে বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে পর্যাপ্ত মাঠকর্ম সম্পাদন সম্ভব হয়নি। তাই স্বীকার করতে হয় যে, যেসব তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা গেছে সময় ও সুযোগ থাকলে আরও কিছু পাওয়া যেত। এছাড়া বিভিন্ন লেখকের কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ ও গবেষণার নাম জানা গেলেও তাঁদের রচিত পাঠ পাওয়া যায়নি। তা সত্ত্বেও গবেষণাটি বাংলা লোকভাষাবিজ্ঞান চর্চার সামগ্রিক রূপরেখা নির্মাণে একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

বাংলা লোকভাষাবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি

বাংলাভাষী অঞ্চলে লোকভাষাবিজ্ঞান-চর্চার প্রেক্ষাপট ও ইতিহাস পর্যালোচনা প্রসঙ্গে বাংলা ভাষাবিজ্ঞান-চর্চার ইতিহাস বিবেচ্য। পবিত্র সরকার তাঁর একটি প্রবন্ধে বাংলা ভাষাতত্ত্বচর্চার প্রয়াসকে চারটি পর্বে ভাগ করে পর্বগুলোর আন্তর-বৈশিষ্ট্য ও গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করেছেন।[৬] তাঁর অনুসন্ধানে চরিত্রগতভাবে ভাষাতত্ত্বচর্চার প্রথম পর্ব প্রথাগত ব্যাকরণ চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসার পর্ব। বাংলা ভাষার চরিত্র অনুসন্ধান ও আবিষ্কার ছাড়াও মান বাংলার মর্যাদা নিরূপণ তখনই সাধিত হয়। এ-পর্বের নেতৃপুরুষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিতীয় পর্ব ছিল বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক

বিবর্তনের পুঙ্খানুপুঙ্খ সূত্র নির্ধারণের পর্ব। এ-পর্বের নেতৃপুরুষদের মধ্যে ছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও সুকুমার সেন। তৃতীয় পর্বের বৈশিষ্ট্য ছিল ভাষার সংগঠন ও এককালিক রূপটির নানা স্তরিক অনুসন্ধান। এ-পর্বে চালর্স ফার্গুসনের পেনসিলভানিয়ায় অপ্রকাশিত কাজটি পর্বারম্ভের সূচক হলেও মূল আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুনীর চৌধুরী। চতুর্থ পর্বে চম্‌স্কি-তত্ত্ব প্রভাবিত একাধিক গ্রন্থ ও নিবন্ধে ভাষার প্রক্রিয়াগুলোর উন্মোচনের নানা প্রয়াস দেখা যায়। এ পর্ব সম্পর্ক পবিত্র সরকার বলেন– 'আমার মতে শতাব্দীর [বিশশতকের] পূর্বার্ধে সর্ববঙ্গীয় ভাষাতত্ত্বচর্চার মূলস্রোতটি অপরার্ধে বর্তমানে বাংলাদেশ নামাঙ্কিত ভূখণ্ডে তার প্রবাহ-পরিবর্তন করে এসে পৌঁছেছে'।[৭] এ-পর্বে বাংলাদেশে নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে রয়েছেন আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, মনসুর মুসা, মনিরুজ্জামান, হুমায়ুন আজাদ, রাজীব হুমায়ুন, মহাম্মদ দানীউল হক প্রমুখ। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে পবিত্র সরকার, মৃণাল নাথ, পুণ্যশ্লোক রায়, উদয়নারায়ণ সিংহ প্রমুখ পণ্ডিত দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে আসছেন। এই চতুর্থ পর্বে প্রথমে পশ্চিমবঙ্গ এবং পরে বাংলাদেশে সমাজভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতিতে বাংলাভাষার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সূত্রপাত ঘটে। এই পর্ব অর্থাৎ সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে আশির দশকের শেষ-অবধি সমাজভাষাবিজ্ঞান চর্চার জোয়ারের কাল। এই পর্বে লোকভাষাবিজ্ঞান, চিহ্নবিজ্ঞান, নৃভাষাবিজ্ঞান প্রভৃতি পদ্ধতির ভাষাবিজ্ঞানচর্চারও সূত্রপাত ঘটে। বাংলা 'Folk-linguistics' বা লোকভাষাবিজ্ঞান চর্চার উদ্ভব ও বিকাশ সমাজভাষাবিজ্ঞান ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন বিদ্যাচর্চার সূত্র ধরেই। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, লোকভাষা এক ধরনের সামাজিক ভাষা এবং এই ভাষা লোকসংস্কৃতিজাত। সুতরাং লোকভাষা-চর্চা সমাজভাষা ও লোকসংস্কৃতির সূত্র ধরে হবে এটা খুব স্বাভাবিক।

ভাষাবিজ্ঞানের স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে সমাজভাষাবিজ্ঞান আত্মপ্রকাশ করার আগেই বঙ্গীয় অঞ্চলে সমাজ-সূত্রের সঙ্গে ভাষাসূত্রের সম্পর্ক ও এদের পারস্পরিক প্রভাব-বিষয়ক চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছিল। রচনাগুলো ছিল বাংলাভাষাকে কেন্দ্র করে এবং আলোচনা-পর্যালোচনা ছিল বিবরণমূলক, কিছু কিছু তত্ত্ববদ্ধ প্রণালি ধরে; তবে তা বিশ্লেষণাত্মক নয়। ঔপনিবেশিক শাসন, জাতীয়তাবাদী চেতনা ও আত্মপরিচয়ের সংকটের মুখোমুখি অবস্থায় আঞ্চলিক উপভাষা, গোষ্ঠীর ভাষা, প্রান্তিক মানুষের ভাষা, নারীর ভাষা, পেশাজীবী মানুষের ভাষা ও প্রাত্যহিক জীবনের ভাষাকে মর্যাদা দিয়ে সংগ্রহ ও আলোচনাযোগ্য করার অভিপ্রায়ে এ-ধরনের ভাষাচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল বলে ধারণা করা সম্ভব। শুরুর দিকে শ্রীরামপুরের মিশনারিজ, কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-সূত্রে কিছু বিচ্ছিন্ন ও অ-তাত্ত্বিক রচনা এবং পরবর্তীকালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র রায়, হেমন্তকুমার সরকার, সুকুমার সেন, সারদাচরণ মিত্র, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ আবদুল হাই প্রমুখ এ-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সুতরাং সূত্রপাত যেভাবেই হোক না কেনো —সকলের যথাসাধ্য প্রয়াসে ভাষার সামাজিক-লৌকিক ও সাংস্কৃতিক সূত্র আবিষ্কার থেকে পরবর্তীকালে সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আলোকে স্বতন্ত্র বিদ্যা হিসেবে পথ চলা শুরু করে। এক্ষেত্রে বাংলা-অঞ্চলে সমাজভাষা-গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন সুকুমার সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ (ডি এন) বসু, আফিয়া দিল, মঞ্জুলী ঘোষ, নির্মল দাশ, মনসুর মুসা, পবিত্র সরকার,

ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, মনিরুজ্জামান, পুণ্যশ্লোক রায়, উদয়নারায়ণ সিংহ, খন্দকার আজিজুল হক, মৃণাল নাথ, রাজীব হুমায়ুন, পি এম সফিকুল ইসলাম, সাখাওয়াৎ আনসারী, সৌরভ সিকদার, আবদুর রহিম প্রমুখ।

সমাজভাষাবিজ্ঞান চর্চার উপর্যুক্ত সূত্রে ধরে বিশশতকের ষাটের দশকে আমেরিকায় স্বতন্ত্র বিদ্যার সূচনা এবং সত্তরের দশকে তাত্ত্বিক কাঠামো গড়ে উঠলে প্রায় সমকালে বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে লোকভাষাবিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত হয়। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে, বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে লোকভাষাবিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত ঘটে। এক্ষেত্রে দেখা যায় লোকসাহিত্য বা লোককলা ও লোকসংস্কৃতি গবেষকরাই 'লোকভাষা' বা লৌকিক ভাষা' নিয়ে প্রথম ভাবিত হন এবং পরবর্তীকালে ভাষাবিজ্ঞানী ও ভাষা-গবেষকেরা লোকভাষার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে মনোযোগী হন। লোকভাষাবিজ্ঞান-চর্চায় একক কোনো কৃতিত্ব দিতে হলে পশ্চিমবঙ্গের 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ'কে দিতে হয়। বিগত তিন যুগ ধরে পরিষদের মুখপত্র 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা'য় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ দুই বঙ্গে লোকভাষাবিজ্ঞান চর্চার ধারাকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। চলতি শতকের সূচনালগ্নে পশ্চিম বাংলার বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা স্নাতক পাঠক্রমে লোকভাষাকে পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করে লোকভাষাবিজ্ঞান-চর্চাকে আরও গতিশীল করা হয়েছে। এদিকে, আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে বাংলা অঞ্চলে লোকভাষা নিয়ে পত্রপত্রিকা ও জার্নালে প্রকাশিত হতে থাকে বহুমাত্রিক প্রবন্ধ এবং গবেষণাপত্র। আমেরিকা ও ইউরোপের নানা স্কুল অবলম্বনে এতদঞ্চলের লোকভাষাবিজ্ঞান-চর্চায় প্রযুক্ত হয় নানা তত্ত্ব ও পদ্ধতি। এতে বাংলা লোকভাষাচর্চায় প্রথাগত পদ্ধতি, বর্ণনামূলক ও সাংগঠনিক পদ্ধতি এবং সমাজভাষাবিজ্ঞানের পদ্ধতি বিভিন্ন সময়ে যুক্ত হয়ে পরিণতিতে সংস্কৃতি-অধ্যয়ন ডিসিপ্লিনের সঙ্গে ফোকলোরতত্ত্বের অনুসৃত রীতিপদ্ধতিও অনুসৃত হয়েছে।

বাংলা লোকভাষা-চর্চার প্রারম্ভিক ও ঐতিহ্যিক পর্ব

বাংলা ভাষার প্রথম এ-বিষয় নিয়ে গ্রন্থ লিখিত হয় পর্তুগিজ ভাষায়। গ্রন্থের নাম *ভোকাবলারিও এম ইডিয়মা বেঙ্গালা ই পর্তুগিজ*। এর রচনকাল ১৭৩৪ হলেও প্রকাশকাল ১৭৪৩, রচয়িতা পাদরি মনোএল দ্য আসসুম্পসাও। পর্তুগিজ ভাষায় গ্রন্থটি রচিত হলেও লেখক ব্যাকারণগত দৃষ্টান্ত দিয়েছেন বাংলাভাষায়।[৮] আসসুম্পসাও ভাষা-সচেতন ছিলেন, তাই শব্দকোষে গ্রাম্য শব্দ, আঞ্চলিক শব্দ এবং লোকমুখে প্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দও উদ্ধৃত করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থের বাক্ভঙ্গিমা সাধুরীতির হলেও তিনি পূর্ববঙ্গীয় লোকভাষার প্রয়োগকে উপেক্ষা করেননি। ইংরেজি ভাষায় রচিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ-রচয়িতা ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড ছিলেন ভাষার শুদ্ধতা-পন্থি। ১৭৭৮ সালে প্রকাশিত তাঁর *অ্যা গ্রামার অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ* গ্রন্থে বরং মুসলমান-মুখের আরবি-ফারসিবহুল বাংলার ক্রটিই দেখিয়েছেন।[৯] তবে সংস্কৃতানুসারী হ্যালহেড রচনার বিভিন্ন উদাহরণে যে 'লোক-চলতি' ভাষার প্রয়োগ দেখিয়েছেন তা লোকভাষার একপ্রকার স্বীকৃতির প্রমাণ। বাংলা ভাষার আরেক বিদেশি গবেষক এইচ. পি. ফর্স্টার *অ্যা ভোকাবলারি ইন টু পার্টস, ইংলিশ অ্যান্ড বঙ্গালি, অ্যান্ড ভাইস ভারসা* (১৭৯৯, ১৮০২) নামক দু'খণ্ডের অভিধান গ্রন্থে প্রায় আঠারো হাজার

শব্দের ঠাঁই দিয়েছিলেন।[১০] এসব শব্দের মধ্যে গ্রাম্য শব্দও ছিল প্রচুর। ফর্স্টার ভাষার লোকায়ত রূপের প্রতি সচেতন ছিলেন এবং এ-ব্যাপারে তাঁর বক্তব্যও স্পষ্ট ছিল। তিনি মনে করতেন, ভদ্রসমাজে ও সাহিত্যে Polite বা সাধু ভাষা ব্যবহৃত হয়, এবং সাধারণ মানুষ 'গ্রাম্য ভাষা'য় কথা বলে। ভাষার এই 'গ্রাম্য রূপ'কে তিনি 'Vulgar' বলে অভিহিত করেছিলেন।[১১] অন্যদিকে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন উইলিয়াম কেরি। বাংলা ভাষা নিয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ একাধিক রচনাও রয়েছে। এ-ধরনের গ্রন্থরচনার পেছনের মূল কারণ ইংরেজ সিভিনিয়ানদের বাংলা ভাষা-শিক্ষা। *অ্যা ডিকশোনারি অব বেঙ্গালি ল্যাঙ্গুয়েজ* গ্রন্থের খণ্ড-দুটিতে প্রায় পঁচাশি হাজার শব্দ রয়েছে। এর মধ্যে প্রচুর সংখ্যায় চলতি, আঞ্চলিক ও গ্রাম্য শব্দও বিদ্যমান। লোকভাষাকে যে উইলিয়াম কেরি উপেক্ষা করেননি এটা তার প্রমাণ। তবে ভাষার সমাজতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ও লোকায়ত রূপের প্রকৃষ্ট উদাহরণ ১৮০১ সালে প্রকাশিত উইলিয়াম কেরির *কথোপকথন* গ্রন্থটি। ভাষাবিজ্ঞানীদের বিবেচনায়, 'বাংলা স্ল্যাং বা অকথ্য-শব্দাবলিকে যিনি প্রথম সচেতনভাবে সমাজজ্ঞানের প্রয়োজনে চর্চার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করলেন এবং ইংরেজ সিভিলিয়ানদের আবশ্যিক পাঠ্য বিষয় করে তুললেন' তিনি উইলিয়াম কেরি।[১২] সংলাপ-নির্ভর ভাষাসংগ্রহ *কথোপকথনে* গ্রামশব্দ-সংবলিত মুখের ভাষার নমুনা সংগ্রহই ছিল কেরির মূল উদ্দেশ্য, যা ভাষাশিক্ষার কাজে ব্যবহার করা যায়। এতে ধরা পড়ে ভাষার সরস ও সজীব রূপটি, এবং একই সঙ্গে লোকভাষার নানা নমুনা। নিচে *কথোপকথন* থেকে কিছু নমুনা উদ্ধৃত হলো :[১৩]

> 'তুমি আইসন কালে কেমন দেখিয়া আসিয়াছ মেনে আর কতদিন **লটখটানি** আছে কিনা।'
> 'একবার বলিল ভাদু ধান বেচে দিব আবার এখন এক **পেকনা** করিয়াছে। বুঝি টাকা দিবার গা নাই।'
> 'মর অভাগ্যা। বলিতে একটু লাজ লাগে না **দশনুড়া** তোর মুখে দি।'
> 'সকল কাজি বড় বৌ করে ছোট বৌডা বড় **হিজলদাগুড়া** অঙ্গ লড়ে না।'

এসব উদাহরণ থেকে ভাষার যে নানান সামাজিক ও লৌকিক স্তর রয়েছে তার উপলব্ধি ও গুরুত্ব ধরা পড়ে। উদ্ধৃত সংলাপে অন্তত আঞ্চলিক রূপ ছাড়াও গ্রাম্য ও শ্রমজীবী মানুষের ভাষা, প্রান্তিক মানুষের ভাষা, নারীর ভাষা, গোষ্ঠীর ভাষা, এমনকি কোন্দলের ভাষার বিশেষত্বও ধরা পড়ে। বলাবাহুল্য যে লোকভাষার নমুনা হিসেবে তা সংগ্রহ করা হয়েছিল। বিশেষ লক্ষ্য ছিল বিদেশি সিভিলিয়ানরা যাতে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। ফলে তা তৎকালীন লোকভাষার অনন্য আকর হিসেবে ধরে নেওয়া যায়।

উনিশশতকের গোড়া থেকে বাংলা গদ্যচর্চা নতুন মোড় নিলে গদ্যের ভাষা নিয়ে লেখক ও বুদ্ধিজীবী সমাজে নানান বিতর্ক সৃষ্টি হয়। বিশেষত সাধুবাংলায় ব্যবহৃত অনেক শব্দ ও ইডিয়মের ব্যাপারে। প্রশ্ন ওঠে মান্য শব্দ, গ্রাম্য ও অকথ্য শব্দ নিয়েও। যেমন মাগ, ভাতার, মিনসে প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার। কারো কারো মতে শব্দগুলো অকথ্য এবং একেবারেই অশ্লীল। অথচ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (*প্রভাবতী সম্ভাষণ*) ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (*বিষবৃক্ষ*) তাঁদের রচনায় 'মাগী' শব্দটিকে অনায়াসেই মান্য শব্দ হিসেবে ঠাঁই দিয়েছিলেন। *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৫৮) প্রকাশিত হলে এর ভাষা নিয়েও আপত্তি তুলেছিলেন খোদ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ('বাঙ্গালা ভাষা', ১৮৭৮) ও রামগতি ন্যায়রত্ন (*বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব*, ১৮৭৩)। আবার রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮৫৮)

প্রমুখ পণ্ডিত 'আলালি ভাষা'ই তখনকার কলকাতার মানুষের মুখের ভাষার যথার্থ রূপ বলে অভিহিত করেছেন।[১৪]

আবার সমাজসংস্কারক বিদ্যাসাগর প্রতিপক্ষকে যুক্তিপ্রয়োগে পরাস্ত করতে গিয়ে বিতর্কমূলক রচনায় ব্যঙ্গাত্মক ভাষা ব্যবহার করেছিলেন এবং ব্যঙ্গরস সৃষ্টির প্রয়োজনে তাঁকে অনেক অকথ্য শব্দ ব্যবহার করতে হয়। বিদ্যাসাগর যে ভাষার গ্রাম্য ও লৌকিক রূপের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন এতে তার প্রমাণ মেলে। শুধু তাই নয়, বিষয়টি যে তিনি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতেন তার নিদর্শন 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শব্দ-সংগ্রহ' শীর্ষক রচনাটি। এতে ঔপভাষিক শব্দরূপ ছাড়াও গ্রাম্য ও অকথ্য-শব্দের সচেতন সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়। ওই একই সময়ে *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়* জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা শব্দতত্ত্ব' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আগের বছর অর্থাৎ ১৯০০ সালে প্রকাশিত হয় ললিতকুমার মুখোপাধ্যয়ের 'ভাষাতত্ত্ব' প্রবন্ধটি। এই দুই প্রবন্ধে ভাষার রূপে স্ল্যাং-এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বলতে গেলে সমাজভাষাতাত্ত্বিক যেমন, লোকভাষাতাত্ত্বিকও বাংলা আদিরচনা এই দুই প্রবন্ধ, অন্তত তত্ত্বগত বিবেচনায়। ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের আলোচনার নজির নিচে হাজির করা যায়। তিনি তাঁর প্রবন্ধের শেষে টীকা-আকারে লিখেছেন,

> [...] ভাষাবিজ্ঞানের নিকট গ্রাম্য ভাষা ও সাধু ভাষা উভয়েরই সমান আদর। বরং গ্রাম্য ভাষা হইতে ভাষার মূল প্রকৃতি ও ভাষার সহিত জাতীয় প্রকৃতির সম্বন্ধ যত সহজে বোঝা যায় সাধু ভাষা হইতে তেমন হয় না। এই জন্য গ্রাম্য Slang শব্দের সংগ্রহের যথেষ্ট প্রয়োজন; এই সংগ্রহ কার্য্যে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই।[১৫]

প্রথাগত ব্যাকরণের যুগে অবস্থান করেও জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস একজন প্রাগ্রসর ভাষাবিজ্ঞানীর ভূমিকা পালন করেছিলেন বলেই মনে হয়। একইভাবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (১৩০৮/১৯০১) ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (১৩০৮/১৯০১) শীর্ষক প্রবন্ধ-দুটিতেও ভাষার শিষ্ট-অশিষ্ট রূপের অনুষঙ্গে আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক ও ভাষাবৈজ্ঞানিক দিক উন্মোচন করেছেন। অকথ্য ভাষা কিংবা গ্রাম্য ইতর লোকের ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার যেসব শব্দকে অনেকে 'অকথ্য' বলে অশ্রদ্ধা করেন তাদের বিপরীতে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বক্তব্য ছিল,

> এই সকল শব্দের অধিকাংশই চলতি ভাষায় অর্থাৎ কথাবার্ত্তার ভাষায় ব্যবহৃত হয়। তাহাদের অনেকেরই সাধুভাষার অর্থাৎ সাহিত্যের ভাষায় সম্প্রতি স্থান হয় নাই। হয়ত তাহাদের মধ্যে অনেক শব্দ এরূপ আছে, যাহা প্রকৃতই Slang, অর্থাৎ ভদ্রসমাজে কথাবার্ত্তায় বর্জ্জনীয়। এইসকল অসাধু শব্দের আলোচনা সকলের প্রীতিকর হয় নাই। [...] বৈজ্ঞানিক হিসাবে সকল শব্দেরই সমান আদর। [...] অকিঞ্চিৎকর বলিবার অধিকার তোমার নাই; গ্রাম্য ভাষা বলিয়া অবজ্ঞায় তোমার অধিকার নাই।[১৬]

এভাবে দেখা যাবে ভাষাবিজ্ঞানী হিসেবে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বপর্যন্ত বাংলাভাষার ভাষাতাত্ত্বিক চর্চায় ভূগোল, পরিবেশ, সমাজ-সংস্কৃতি ও লৌকিক অনুষঙ্গ নানাভাবে যুক্ত হয়ে ভাষার প্রকৃতি অনুসন্ধানে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। এক্ষেত্রে বাংলা ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি বোঝার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের লোকমুখের ভাষা। কারণ ভাষানুসন্ধানী বা ভাষাবিজ্ঞানীরা জানতেন একটি ভাষার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো লুকিয়ে থাকে ওই ভাষার কথ্য রূপেই। সেই অর্থে বাংলা ভাষাবিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত হয়েছে লোকভাষাকে কেন্দ্র করেই।

বাংলা লোকভাষাচর্চার বৈজ্ঞানিক সূচনাপর্ব

প্রাচীনত্বের দিক থেকে রাজেন্দ্রকুমার মজুমদারের 'ময়মনসিংহের গ্রাম্যভাষা' (১৯০৫) প্রবন্ধটি লোকভাষাবিজ্ঞান চর্চার প্রথম স্মারক হিসেবে বিবেচনায় নেয়া যায়। ইতিপূর্বে জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন-কৃত বাংলা উপভাষা-সংক্রান্ত জরিপটি সম্পন্ন হয়ে প্রকাশিত হয়েছে ইংরেজি ভাষায়।[১৭] রাজেন্দ্রকুমারের এই কাজটি তাই নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে ময়মনসিংহ অঞ্চলের গ্রাম্য ভাষাকে তিনি চিহ্নিত করে ভাষাটির আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যও নির্ধারণ করতে পেরেছিলেন। একইসঙ্গে তিনি সমীপ্যবর্তী অপরাপর অঞ্চলের গ্রাম্য ভাষার সঙ্গে ময়মনসিংহ অঞ্চলের গ্রাম্য ভাষার সম্পর্কও দেখিয়েছেন ধ্বনিতাত্ত্বিক ও শব্দতাত্ত্বিক দিক থেকে। ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকভাষার ক্ষেত্রে তিনি দেখেছেন ভদ্রসমাজে ও ভদ্রপল্লিতে গ্রাম্যভাষা কীভাবে পরিমার্জিত হয়ে ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু তিনি তাঁর আলোচনা গ্রাম্য ভাষায় সীমাবদ্ধ রেখেই গ্রাম্য ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করেছিলেন,

> ময়মনসিংহের উত্তরসীমায় গারো পর্বত, পর্বতের নিকটবর্তী স্থানসমূহের ভাষা অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আবার শ্রীহট্ট জেলার সংলগ্ন প্রদেশে অনেকটা শ্রীহট্টের ভাষার অনুরূপ ভাষা হইয়াছে। এরূপ পাবনা, কুমিল্লা, ঢাকা, রঙ্গপুর প্রভৃতি জেলার সমীপবর্তী গ্রামাদিতে সেই জেলার ভাষার অনুরূপ ভাষা প্রচলিত। [...]
>
> ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চলের ঝালো বা মালো জাতীয় মৎস্য-ব্যবসায়ী ও নৌকাবাহী লোকের একপ্রকার অদ্ভুত উচ্চারণ করিয়া কথা কহে। সে সকল উচ্চারণ শুনিয়া বোঝা অপেক্ষা লিখিয়া বোঝানো অত্যন্ত কঠিন।[১৮]

রাজেন্দ্রকুমারের ভাষাপ্রকৃতি বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গি বিচিত্র ছিল। তিনি অঞ্চলটির গ্রাম্যভাষা ধ্বনিতাত্ত্বিক কিংবা শব্দতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণে স্থির না-থেকে আঞ্চলিক বৈচিত্র্যও চিহ্নিত করেছেন। এছাড়া নানা উপাদান নিয়ে লোকভাষা কীভাবে লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতিকে ধারণ করে তারও নমুনা হিসেবে কৃষকদের মুখের বুলি, কৃষিসংক্রান্ত শব্দাবলি, পশুকে ডাকার শব্দ ও শব্দসংকেত, গ্রামাঞ্চলের নানা ফল-ফসলের নাম ইত্যাদির উল্লেখ করে লোকভাষার চারিত্র্যধর্ম দেখানোরও প্রয়াস পেয়েছেন।

যোগেশচন্দ্র রায়ের 'রাঢ়ের কথিত ভাষা' প্রবন্ধটি লোকভাষাবিজ্ঞান চর্চার আরেক আদি নিদর্শন। ১৯১২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর *বাঙ্গালা ভাষা* বইটি। এই বইয়ে তিনি লিখিত ও সাহিত্যের ভাষা প্রসঙ্গ, এমনকি বাংলা ব্যাকরণের আলোচনায় রাঢ়ের কথিত ভাষা নিয়ে গ্রাম্য লোকভাষার আলোকপাত করেছিলেন। বাংলার লোকভাষা বা গ্রাম্যভাষার ব্যাপারে তাঁর ধারণা ও মতামত ছিল সুস্পষ্ট। তিনি মনে করতেন কথিত ভাষা লিখিত ও সাহিত্যের ভাষাকে জীবিত রাখে। লিখিত ও সাহিত্যের ভাষা কৃত্রিম এবং কৃত্রিম বলেই বাংলা নামে ভাষাটি হতে পেরেছে। তাই বাংলা ভাষা যেমন শুধু কলকাতার ভাষা নয়, তেমনি নয় বাংলার উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলের ভাষাও। বাংলার সকল স্থানের ভাষার উপাদান নিয়ে বাংলা ভাষাটি গঠিত। তাই বাংলা ভাষা ও তার ব্যাকরণ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সে-সব লোকভাষার সুলুক-সন্ধানের কথা তিনি বলেছেন। কেননা, তাঁর মতে, 'গ্রাম্য ভাষা, প্রাকৃত ভাষা, সাধু ভাষা—এই তিন একই ভাষা। কেহ এই তিনের সীমালি বাঁধিয়া পার্থক্য দেখাইতে পারিবেন না। কথিত ভাষাই, বাঙ্গালা ভাষার ন্যায়, যাবতীয় চলিত ভাষার

প্রাণ।'[১৯] সেই প্রাণরূপকে চিহ্নিত করতে গিয়ে তিনি দক্ষিণ রাঢ়ের লোকভাষার অবলম্বন করেছেন। দেখিয়েছেন বাংলার ক্রিয়াপদের রূপ, বিভক্তি, ধ্বনিরূপ, শব্দরূপ ইত্যাদি কীভাবে চলিত বাংলায় আত্মস্থ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি রাঢ়ের লোকভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যও চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন।

লোকভাষা চর্চায় আরও এক পথিকৃৎ হেমন্তকুমার সরকার। তাঁর গবেষণাগ্রন্থের নাম ছিল *ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা ভাষার ইতিহাস* (১৯২৩)। হেমন্তকুমার ধ্বনিতত্ত্ব বা শব্দার্থতত্ত্বের পাশাপাশি ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে বাংলা ভাষার ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন। তখনও উপভাষাতত্ত্ব কিংবা সমাজভাষাতত্ত্বের উদ্ভব ও চর্চা শুরু না হলেও তিনি গ্রাম্যভাষা বা 'ছোটোলোকে'র ভাষার অনুসন্ধান করেছিলেন বাংলা ভাষার প্রকৃত চরিত্র বোঝার জন্য। হেমন্তকুমার ভাষাবিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন 'ছোটোলোকে'র ভাষা আর 'ভদ্রলোকে'র ভাষার ভেদরেখার মূলে সামন্তবাদী মানসিকতা, যার সৃষ্টি অর্থ ও সমাজব্যবস্থা থেকে। যে-ভাষাকে গ্রাম্য বা ছোটোলোকের বলে মানুষ নাক সিটকায়, সেটাই আদপে ভাষার মূল স্রোত, ভদ্রলোকের ভাষা সে-ভাষা থেকেই জাত। তাঁর বইয়ের 'অনাদৃত ভাষার কৌলীন্য' অংশে গ্রাম্যভাষা নিয়ে লিখেছেন,

> 'কিরিআ কম্মে' 'জম্মে'র মধ্যে সেই চাষা যখন একটু আধটু 'মংস' খায় এবং বিয়ের কনেকে 'দুতিয়ে'র দিন 'সেঁদুর' দিয়ে 'ডোলায়' চড়িয়ে 'নগন' করে শ্বশুরবাড়ি পাঠায় ও 'নোকে কুচ্ছা' করলে তার মুখের 'ছিরি' অমনি কেমন হয়ে যায় তখনো আমরা এই সকলের ভিতর সরল কৃষক জীবনের ও তার ভাষায় অবিমিশ্র খাঁটি ভাব দেখিতে পাই।[২০]

হেমন্তকুমার দেখিয়েছেন এসব লোকভাষার মধ্যেই ভাষার বিশুদ্ধ রূপ রক্ষিত থাকে, এবং দেশের কোনো একটি ভাষাছাঁচের ওপর ভিত্তি করেই বাংলা সাধু ভাষা গঠিত হয়।

বিশ শতকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছিল 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'। পরিষদের পত্রিকায় শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে 'কোনোপ্রকার প্রশিক্ষণলব্ধ প্রযুক্তি বা তাত্ত্বিক জ্ঞান ছাড়াই' লেখকগণ নিজ নিজ অঞ্চলের শব্দ ও ভাষা সংগ্রহ করে প্রকাশ করতে থাকেন।[২১] এসব লেখকের মধ্যে রয়েছে সতীশচন্দ্র ঘোষ (১৩০৯, ১৩১৩), রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার (১৩১২), সুরেশচন্দ্র রায়চৌধুরী (১৩১২), রজনীকান্ত চক্রবর্তী (১৩১৪), সত্যসুন্দর বসু (১৩১৫), পরমেশপ্রসন্ন রায় (১৩১৬), কৃষ্ণনাথ সেন (১৩১৯) হরিনাথ ঘোষ (১৩৩৩, ১৩৩৪), রাখালরাজ রায় (১৩২২), নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৩৩৩), মোল্লা রকীব উদ্দীন আহমদ, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী প্রমুখ। প্রকাশিত রচনাসমূহে লোকভাষার শব্দভাণ্ডারসহ লৌকিক ভাষাতাত্ত্বিক ও অ-ভাষাতাত্ত্বিক নানা উপাদান দেখতে পাওয়া যায়। প্রায় সমসাময়িক কালে আরও কিছু পত্রপত্রিকা যেমন *অর্চনা*, *প্রবাসী*, *ভাষা* প্রভৃতিতেও এ-জাতীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিশেষ করে আঞ্চলিক ভাষা, জনগোষ্ঠীর ভাষা, পেশাজীবীর ভাষা, নারীর ভাষা সংক্রান্ত রচনা যা লোকভাষার প্রতিনিধিত্ব করে। এজাতীয় রচনার মধ্যে ১৯২৪ সালে *বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়* প্রকাশিত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'খুলনা জেলার মাঝির ভাষা' একটি। লেখাটি শব্দসংকলন হলেও লোকভাষাচর্চার একটি উজ্জ্বল কাজ হিসেবে ধরে নেয়া যায়। কারণ এ-ধরনের ভিত্তির ওপরে পরবর্তীকালে সমাজভাষা বা

লোকভাষা চর্চা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। লেখাটিতে নরেন্দ্রনাথ উপভাষাগত যে-ভূগোল তার কোনো তত্ত্বের ওপর নির্ভর না-করেও খুলনা জেলার অবস্থান নির্ধারণ করেছেন। লোকভাষার বৈশিষ্ট্য আলোচনায় তিনি সমাজভাষিক ও লৌকিক কিছু উপাদানের অনুসন্ধান করেছেন যা খুব গুরুত্বপূর্ণ।[২২]

বাংলা ভাষায় লেখা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষাতত্ত্ববিষয়ক প্রথম বইয়ের নাম *বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা* (১৯২৯)। তাঁর বইয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়ে স্থান পেয়েছে 'বাঙ্গালা ভাষার উপাদান ও গ্রাম্য-শব্দ-সঙ্কলন' প্রবন্ধটি। বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষার উদ্ভবের ইতিহাস নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি বাংলার ভাষার মৌল উপাদান হিসেবে গ্রাম্য শব্দগুলোকে 'অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান' বলে মন্তব্য করেছেন। বাংলা ভাষার বুনিয়াদ গঠনে এই গ্রাম্য শব্দগুলোই যে প্রধান ভূমিকা রেখেছে এবং তা গণমানুষের অভিব্যক্তির সরল-স্বাভাবিক-সৌন্দর্যের অনবদ্য প্রকাশ হিসেবে ভাষায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে অকৃত্রিমভাবে তা বিশদ আলোচনা ও বিশ্লেষণে বিধৃত করেছেন। বাংলা ভাষার এই গ্রাম্য শব্দভাণ্ডার যে কোনোভাবেই অবহেলার বস্তু নয়, বরং গৌরবের সে বিষয়ে তার মন্তব্য হচ্ছে,

> বাঙ্গালা ভাষার শত শত প্রাকৃত-জ এবং দেশী অর্থাৎ অনার্য শব্দ, গ্রাম্য ভাষায় এখনও বিদ্যমান আছে। কিন্তু সেই সকল শব্দ এখন অনাদৃত, এবং কৃষক ও অন্য নিরক্ষর সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ। বহু স্থলে শহরের ভাষার প্রভাবে এবং সংস্কৃত ও ফারসির চাপে পড়িয়া এই সব শব্দ লোপ পাইতেছে। অবশ্য পল্লী-জীবনের বৈশিষ্ট্য কৃষি প্রভৃতি বিষয়ক বহু শব্দকে শহরের ভাষা সহজে মারিতে পারিবে না। কিন্তু এইসকল তদ্ভব ও দেশী বা অজ্ঞাত-কুলশীল শব্দের ভিতরেই আমাদের ভাষার ও জাতির ইতিহাস লুক্কায়িত আছে।[২৩]

পূর্বে ১৯২৬ সালে প্রকাশিত *The Origin and Development of Bengali Language* গ্রন্থেও তিনি গ্রাম্য শব্দভাণ্ডার ও প্রাকৃতজনের মুখের বুলিকে বাংলা ভাষার মূল প্রবাহ বলে অভিহিত করেছিলেন।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে লোকভাষাচর্চার পরবর্তী নিদর্শন হিসেবে সুকুমার সেনের 'বাঙলায় নারীর ভাষা' (১৯২৯) প্রবন্ধটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রবন্ধে তিনি পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানী অটো য়েসপারসেনের অনুপ্রেরণায় বাংলাদেশের নারীদের ভাষার বিশেষত্ব অনুসন্ধান করেছেন। নারীর ভাষার স্বরূপ সন্ধানে তিনি বেছে নিয়েছিলেন মূলত পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান ও পশ্চিমবঙ্গের নারীদের মুখের ভাষা। অর্থাৎ তিনি বিশেষ উপভাষা বেছে না নিয়ে সে-সব অঞ্চলের গ্রাম্য ভাষার নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন। সুকুমার সেনের অনুসন্ধানে তাই প্রথম বেরিয়ে আসে লোকভাষার সমাজতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক অনেক বৈশিষ্ট্য।[২৪] বাংলাদেশের নারীর ভাষার বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে সুকুমার সেন লোকভাষার লিঙ্গকেন্দ্রিক প্রবণতাকেও সূত্রাবদ্ধ করেছেন, যা পরবর্তীকালে সমাজোপভাষা ও লোকাভাষা চর্চার ইতিহাসে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে।

দীনেশচন্দ্র সেনের বাংলা লোকভাষা নিয়ে অনুসন্ধান লোকসাহিত্যের ভাষা বিষয়ক প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা। আলোচনায় তিনি *পূর্ববঙ্গ* ও *মৈমনসিংহগীতিকার* কয়েকটি গীতিকা/পালার ভাষা সম্পর্কে নিজের বিচার-বিশ্লেষণ হাজির করে দেখান যে, 'পল্লীগীতিকার ভাষা খাঁটি বাঙ্গালীর

ভাষা, তাহা আধা-সংস্কৃত আধা ইংরাজীর খিচুড়ি নহে। যে ভাষাকে আমরা মাতৃভাষা বলিয়া জানি, ইহা সেই ভাষা।'[২৫] দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, পাণ্ডুলিপিতে কিংবা ছাপার হরফে যখন সাজানো হয় তখন ভাষাটির স্বভাবধর্ম বিকৃত করে সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণের অনুকরণে কৃত্রিম বা মেকি করে তোলা হয়। আবার লোকভাষায় অঞ্চল থেকে অঞ্চলে ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তনের যে-প্রবণতা গীতিকাগুলোতে তাও তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। লোকভাষার শব্দতাত্ত্বিক আলোচনায় দেখিয়েছেন বঙ্গদেশে লোকভাষার শব্দসম্পদে কোনোরূপ কারচুপি নেই, ঋণ নেই। বরং বস্তুপৃথিবী ও জীবনের গভীর বোধ থেকে উদ্ভূত ও লালিত যে 'মহাজনেরা ও পল্লীকবিরা উভয়েই বাংলার দেশজ শব্দের ভাণ্ডার লুটিয়াছেন, কেহ কাহারও ঋণ গ্রহণ করেন নাই।'[২৬]

অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দক্ষিণ-বঙ্গের কথ্য ভাষা' প্রবন্ধটি ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয়। মূলত প্রবন্ধটি কলকাতার অদূরের গ্রাম্যভাষার নমুনাসংগ্রহ হলেও তাতে লেখকের লোকভাষা বিষয়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বিধৃত রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গ কলকাতার খুব নিকটে অবস্থিত, তা হলেও অঞ্চলটির ভাষায় রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য। লেখক নমুনাসংগ্রহে তারই অনুসন্ধান করেছেন। নমুনার পর কিছু বিশ্লেষণ হাজির করে দক্ষিণবঙ্গের গ্রাম্যভাষার রূপের বৈশিষ্ট্যকে তিনি শনাক্ত করে দেখিয়েছেন। দক্ষিণ বঙ্গের লোকভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে তাঁর পর্যবেক্ষণ হচ্ছে,

> 'চ' ও 'ছ'-এর উচ্চারণে 'স'-এর প্রভাব বিদ্যমান। শব্দের অন্তস্থ থ-কার বা দ-কার ত-কারের বেশী মর্য্যাদা পায় না। স্বরের বিন্যাসে 'ই' স্বরের প্রাদুর্ভাব অন্য স্বরের থেকে বেশী। বিশেষ 'এ'কারের স্থানে প্রায়ঃশই ই-কার উচ্চারিত হয়, যেমন—মদ্দি, পুকুরির, দিতি, দেখ্তি, খেতি, লামতি ইত্যাদি। ই-কারের পরেই অ-কার ও ও-কার। অন্য স্বরের প্রয়োগ এই কটী স্বর অপেক্ষা কম। অতীত কালবাচক ক্রিয়াপদগুলো 'লাম্' বা 'লুম'-যুক্ত হয়ে প্রথম পুরুষ প্রকাশ করে না, 'লুম'যুক্ত হয়েই উচ্চারিত হয়।[২৭]

দীনেন্দ্রকুমার রায় *পল্লী-চিত্র* (১৯০৪) বইটির শেষে নদীয়া অঞ্চলের অনেকগুলো গ্রাম্যশব্দের তালিকা দিয়েছিলেন। এছাড়া *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*র ষোলো ও উনিশতম খণ্ডে নদীয়া অঞ্চলের কিছু অংশের গ্রাম্যশব্দের তালিকা মুদ্রিত হয়। কিন্তু ভাষাটির ওপর প্রথম আলোকপাত করেন চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ১৯৪৫ সালে, প্রায় চার বছর নদীয়া অবস্থান করে সেখানকার শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষের মুখের ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ তিনি করেছিলেন। প্রবন্ধটিতে তিনি ধ্বনিতাত্ত্বিক রূপ ও শব্দরূপের বিষয়গুলো চিহ্নিত করেছিলেন এবং এ-ব্যাপারে তাঁর পর্যবেক্ষণ ছিল–

> নদীয়ার ভাষাবৈচিত্র্যের অন্যতম কারণ—পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সান্নিধ্য ইহার উত্তরপূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব জুড়িয়া পাবনা, ফরিদপুর ও যশোহর জিলা বিরাজমান। তাই এই সব জিলার ভাষার সহিত নদীয়ার ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য। [...] নদীয়ার প্রচলিত শব্দের বৈচিত্র্যও কম নয়। এ স্থলে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের সহিত সাদৃশ্য লক্ষণীয়।[২৮]

সুকুমার সেনের ভাষাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান বিচিত্র ধরনের ছিল, ১৯৫৫ সালে বর্ধমানের মুচিদের ভাষার ওপর তাঁর ইংরেজি ভাষায় রচিত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। পরে সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বর্ধমানের মুচিদের ভাষা' নামে প্রবন্ধটির বাংলায় সংক্ষেপীকৃত অনুবাদ প্রকাশ করেন। সুকুমার সেন ভাষাটির ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসহ নিজস্ব শব্দভাণ্ডার দেখিয়েছেন। লোকভাষার প্রান্তবর্তী রূপ হিসেবে মুচিদের

ভাষাকে চিহ্নিত করে তা যে ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে তাও পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তিনি। বর্ধমানের এই বিশেষ লোকভাষা প্রসঙ্গে সুকুমার সেনের মন্তব্য যে :

> পশ্চিমবাঙলার হিন্দুদের মধ্যে মুচিরা সবচেয়ে নীচু ও অচ্ছুত জাত; তবে ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানে ঢাকীদের একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। সম্পূর্ণ সমাজবর্জিত এই জনগোষ্ঠী তাদের নিজেদের একটা ভাষা গঠন করে নিয়েছেন এবং তা এখনও বজায় রাখতেও পেরেছেন। স্থানীয় উপভাষার সঙ্গে তাঁদের এই (গোষ্ঠী) ভাষার কোনো ব্যাকরণগত প্রভেদ নেই, তবে স্বাতন্ত্র্য আছে শব্দভাণ্ডারে।[২৯]

তখন পর্যন্ত বাংলা ভাষাতত্ত্ব চর্চা ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক পদ্ধতি পেরিয়ে সাংগঠনিক পদ্ধতিতে প্রবেশ করেছে এবং বাংলা অঞ্চলে উপভাষাতত্ত্ব বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করছে। ষাটের দশকে ইউরোপ-আমেরিকায় ভাষাবিজ্ঞানের সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতির সঙ্গে লোকভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতি উদ্ভবের কালপর্বের বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার নতুন ক্ষেত্র আবির্ভূত হয়, যার মাধ্যমে ফোকলোরবিদ ও ভাষাবিজ্ঞানীরা লোকভাষা সম্পর্কেও আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সুতরাং এর আগে বাংলা লোকভাষা চর্চায় তাত্ত্বিক পদ্ধতি কিংবা বিশ্লেষণের যে ভিত্তি থাকবে না তা খুব স্বাভাবিক। তবে লোকভাষা বিষয়ক রচনা, নমুনাসংগ্রহ ও শব্দসংকলনসমূহে লোকভাষাতত্ত্বের নানা উপাদান সন্নিবেশিত হয়ে আসছিল। এ-প্রসঙ্গে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র *বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধানটি* (১৯৬৫) খুব গুরুত্বপূর্ণ। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কাজটি করেছিলেন বাংলাদেশের উপভাষাগুলোকে মাথায় রেখে। এইজন্য ভূমিকাংশে উপভাষা ও উপভাষার শ্রেণি নিয়ে বিশাল প্রবন্ধও লিখেছিলেন। সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ বাংলার উপভাষা কিংবা গ্রামীণ ও লোকভাষাসমূহের আলোচনায়। বর্তমান আলোচনার জন্যও বইটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, বাংলাদেশের আঞ্চলিক বা উপভাষাগুলোর শব্দভাণ্ডার সংকলন করতে গিয়ে এতে সমগ্র বাংলাদেশের গ্রামীণ বা লোকভাষার শব্দাবলিও স্থান পেয়েছে উচ্চারণ, ব্যুৎপত্তি ও অর্থ-সহ। এমনকি সমান শব্দ কোন কোন অঞ্চলের গ্রাম্যভাষায় ব্যবহৃত হয় তাও এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রসঙ্গত শব্দগুলোর ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপমূলতাত্ত্বিক ও বাগর্থতাত্ত্বিক নানা আলোচনাও করেছেন। কিছু কিছু শব্দের লৌকিক অনুষঙ্গও তুলে ধরেছেন। এই কাজটি অসম্পূর্ণ ছিল, কারণ ভুক্তিতে শুধু বাংলাদেশের গ্রাম্যভাষার শব্দই যুক্ত হয়েছে, বাংলার বাদবাকি সব আড়ালে রয়ে গেছে। এটা নিয়ে তাঁর আক্ষেপও ছিল।'[৩০]

বাংলা লোকভাষাবৈজ্ঞানিক চর্চার অগ্রযাত্রা

লোকভাষা লোকসংস্কৃতির শক্তিশালী শাখা, যার মাধ্যমে লোকসমাজ পারস্পরিক যোগাযোগ ও কৃত্য সাধন করে থাকে। তাত্ত্বিক জায়গা থেকে লোকসংস্কৃতির সঙ্গে লোকভাষার সম্পৃক্ততা ও তার স্বরূপ নিয়ে জিজ্ঞাসার সূত্রপাত ঘটে প্রথম ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে। ১৯৭০ সালে প্রকাশিত একটি সংকলনে এর শিরোনাম ছিল 'বাংলার লৌকিক ভাষা'। প্রবন্ধের শুরুতে তিনি প্রশ্ন রেখেছিলেন 'লৌকিক ভাষা বলতে আমরা কী বুঝি? লোকসংস্কৃতির সঙ্গে লৌকিক ভাষার সম্পর্কই-বা কী?' সারা প্রবন্ধজুড়ে এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিলেন তিনি। একই সংকলনে বরেণ্য ভাষাবিজ্ঞানী সুকুমার সেনেরও 'লোক-সাহিত্যের ভাষা' শিরোনামে আরেকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের বিষয়ও লোকসংস্কৃতি ও তজ্জাত সাহিত্যের ভাষা নিয়ে। ওখানেও লৌকিক বা লোকভাষার

অনুসন্ধান করা হয়। এই দুটি প্রবন্ধ বাংলা অঞ্চলে লোকভাষাবৈজ্ঞানিক চর্চার প্রবেশক হিসেবে গণ্য করা যায়।

ভক্তিপ্রসাদ দেখিয়েছেন লোকভাষা লোকসংস্কৃতি-উদ্ভূত, আর বাংলার লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে গ্রামীণ কৃষিজীবনকে কেন্দ্র করে। বাংলার এই লোকসংস্কৃতির যাত্রাও সুদূর অতীত থেকে; দেশীয় আচার-অনুষ্ঠান, লোকাচার, পূজাপার্বণ ইত্যাদি আর্যেতর সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। অর্থাৎ বাংলার লোকসংস্কৃতি অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভোটচীনীয় ও আর্যসংস্কৃতি দ্বারা যেমন গঠিত, তেমনি বৌদ্ধ ও ইসলামিক সংস্কৃতির সমন্বয়ও তাতে রয়েছে। যদিও সময় ও উৎপাদনব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ-বর্জনের ভেতর দিয়ে এর রূপান্তরও ঘটেছে। তবে সংস্কৃতি যেখানে সমাজজীবনের ওপর-কাঠামো, ভাষা তা নয়। ভাষা একই সঙ্গে সংস্কৃতি-উদ্ভূত ও তার বাহনও। তাই লোকজীবন-আহূত লৌকিক ভাষা প্রসঙ্গে ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের সুগভীর পর্যবেক্ষণ খুঁটিয়ে দেখলে লৌকিক ভাষা-পরিচয়টিও বেরিয়ে আসে। তাঁর বিশ্লেষণে,

> [...] বাংলার লোকসংস্কৃতির মতো লোকভাষাও গ্রাম বাংলার কেন্দ্রে অবস্থিত। লোকভাষা খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা। কৌলীন্যবর্জিত কৃত্রিমতামুক্ত ভাষা হাজার হাজার মুক্তধারার মতো বয়ে চলেছে লোকমুখে। সামন্ততন্ত্র, আধা-সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র মুখের ভাষাকে সম্পূর্ণ নতুন রূপ দিতে অক্ষম।[৩]

গ্রামীণ মানুষের মুখের ভাষা ছাড়াও লৌকিক ভাষার বিশেষ নিদর্শন হিসেবে লোকসাহিত্যকে মনে করা হয়। ভক্তিপ্রসাদের মতে, বাংলা লোকসাহিত্যের ভাষায় লৌকিক ভাষার যথাযথ প্রতিফলন ঘটেনি। কারণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন যে, ভাষাকে লিপিবদ্ধ করতে গেলে যে-লিপিমালার প্রয়োজন প্রচলিত লিপিতে তার যথাসম্ভব প্রকাশের উপায় নেই। কেননা লিপিগুলো মানভাষা কিংবা উপভাষা কিংবা লোকভাষার যথাযথ উচ্চারণে অক্ষম। ফলে উপভাষা বা লোকভাষা যখন লিপির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তা বস্তুনিষ্ঠভাবে আসে না বলে ভাষাগুলোর সম্যক চরিত্রও ফুটে ওঠে না। মান ভাষার মতোই তা আড়ষ্টতা ও কৃত্রিমতার দোষে দুষ্ট হয়ে ওঠে। এভাবে উপভাষা বা লৌকিক ভাষার শব্দ যখন লিখিত রূপ দেওয়া হয় তাতে উচ্চারণে যে বৈচিত্র্য রয়েছে তা অস্বীকার করে কথ্য প্রমিত রীতির বানান মারফতে প্রকাশ করা হয়। এছাড়া এমন কিছু শব্দ আছে যা বিভিন্ন অঞ্চলে সমান বা ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু অঞ্চলভেদে তার উচ্চরণ বা ঢং ভিন্ন ভিন্ন অথচ বানানে সমানরূপে লেখা হয়। সুতরাং বিষয়টি লোকভাষার বৈশিষ্ট্য বহন করে না। শব্দরূপের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে মেদিনীপুরের কন্টাই সাব-ডিভিশনের কিছু অঞ্চলে ল-এর উচ্চারণ সাধারণ উচ্চারণ থেকে একেবারেই ভিন্ন। বর্ধমানেও ম-কে আনুনাসিক বিযুক্ত করে উচ্চারণ প্রবণতা কিছু সম্প্রদায়ের আছে। কলকাতা ও বাংলাদেশের বেশ কিছু অঞ্চলে 'ড়' ও র-এর উচ্চারণ অভিন্ন; 'শ' অনেক স্থানে স-এর মতো। এই বৈচিত্র্য প্রায়শ গণ্য করা হয় না বলে উপভাষা কিংবা লোকভাষার স্বতন্ত্র ধ্বনিবৈশিষ্ট্যকে অস্বীকারও করা হয়। অথচ এর ব্যত্যয় ঘটলে ভাষার নিজস্বতা একেবারে গণসম্মিলনে হারিয়ে যেতে বাধ্য। ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে,

> অ, আ, ক, খ প্রভৃতি যাদের আমরা বিভাজ্যধ্বনি (Segmental phoneme) বলি সেগুলির শ্বাসাঘাত, স্বর, স্বল্প বিরাম (Phonetic juncture), অল্প বিরাম (Phonemic Juncture) প্রভৃতি ধ্বনিগত প্রভাব অনেক সময় ছড়া কবিতা গানকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে পারে। শ্বাসাঘাত, স্বর বা বিরামের ভুল প্রয়োগে অর্থান্তর ঘটা বিচিত্র

> নয়। কবিতা ছড়ায় যেমন অনুপ্রাসের কাব্যালঙ্কার রয়েছে, তেমনি টোন (Tone) যেখানে (Phonemic contrast) সৃষ্টি করে যেমন তিব্বতি, বর্মী, প্রভৃতি ভাষা এবং তিব্বতী-বর্মী প্রভাবমুক্ত বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় উপভাষায় হয়তো Tone বিশিষ্ট Phoneme-এর রূপ নিয়েছে। হয়তো আমরা দেখব যে, একই ছড়া কবিতা তিব্বতী-বর্মী প্রভাবমুক্ত হয়ে মধ্য বা পশ্চিম বাংলায় এসেছে কেবলমাত্র শব্দ বা অর্থ পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই নয়, Tone যাকে আমরা Supra segmental phoneme বলি, তারও পরিবর্তন ঘটে গেছে।[৩২]

অর্থাৎ উপভাষা কিংবা লোকভাষা চর্চায় এসব বৈজ্ঞানিক অনুষঙ্গ আমলেও নেয়া হয়নি। শুধু শব্দরূপকে ভাষার প্রধান উপাদান বিবেচনা করলে সংকট বাড়ে বই কমে না। তাই লোকভাষা সংগ্রহ ও চর্চার ক্ষেত্রে সে-ভাষার Phonological structure অন্বেষণ জরুরি, যা এযাবৎকালে অন্বিষ্ট হয়নি। এসব বিবেচনায় তাঁর সুপারিশ ছিল একটি লোকভাষায় যতগুলো বিশিষ্ট ধ্বনি রয়েছে তা অন্বেষণ, এমনকি লোকভাষার স্বতন্ত্র যুক্তব্যঞ্জন ধ্বনিগুচ্ছেরও তালিকা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। শুধু তা নয়, সে-অনুযায়ী লোকভাষার লিখিত রূপ দিয়ে জনসমক্ষে প্রকাশ করা দরকার। তবেই লোকভাষাগুলোর যথাযথ বৈশিষ্ট্যসহ তার সংরক্ষণ সাধিত হবে।

সুকুমার সেন লোকসাহিত্যের ভাষা অনুসন্ধানে লোকভাষা অর্থে 'কথ্যভাষা'র কথা বলেছেন। লোকভাষার প্রথম বৈশিষ্ট্য হিসেবে তিনি 'স্থানীয় বিশেষত্ব'কে চিহ্নিত করেছেন, যে-বিশেষত্বটি অর্জিত হয় স্থানীয় লোকসংস্কৃতির কারণে। দ্বিতীয়ত, লোকসাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষাছাঁদে যে-মার্জনা আসে তার জন্য শিক্ষার প্রসার ও চলিত ভাষার প্রভাবে প্রান্তবর্তী ভাষা হিসেবে লোকভাষিক বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ন হওয়াকে দায়ী করেছেন। লোকভাষার কালে কালে রূপান্তরিত হয়ে কীভাবে লোকসাহিত্যে প্রয়োগ ঘটে তার উদাহরণ দিয়েছেন কয়েকটি শিশুতোষ ছড়ার মাধ্যমে। 'লোক-সাহিত্যের ভাষা' প্রবন্ধটি লোকভাষা পরিবর্তনের ধারা কীভাবে বহমান থাকে, কীভাবে লোকসংস্কৃতি ও অপরাপর বহিস্থ কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রয়োজন অনুসারে পোশাক বদল করে তারও সমাজভাষাতাত্ত্বিক ও মনোভাষাবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। সুকুমার সেন দেখিয়েছেন ছেলে-ভুলোনো ছড়ার মধ্যে যে-গুলো মা-ঠাকুরমা-দিদিমা-পিসি-মাসির উক্তি-প্রত্যুক্তি সেগুলোর ভাষাছাঁদের বিশেষত্ব তার বেশিরভাগই শব্দ ও পদপ্রয়োগে। শব্দের ধ্বনিপরিবর্তনেও বিশেষত্ব রয়েছে, যেমন পদান্তে উ-কারের পরিবর্তন। এ-ধরনের পরিবর্তন দ্বারা পদটাতে আদর, মমতা ও স্নেহ ধ্বনিত হয়। উ-কার ধ্বনিটি উচ্চারণে ঠোঁট-দুটি সংকুচিত হয়, যা চুমু খাওয়ার বেলায় ঘটে। লোকভাষার মধ্যে স্থানীয় লোকসংস্কৃতিগত সকল উপাদান যেমন ভাষাসংগঠনে বিদ্যমান থাকে, তেমনি থাকে বাগার্থেও। এসবের পরিবর্তনও ঘটে লৌকক প্রক্রিয়ায়। সুকুমার সেন শব্দ ও বাগর্থগত পরিবর্তনকে দেখিয়েছেন বাংলাদেশের 'এক ছিয়লি রান্ধে বাড়ে এক ছিয়লি খায়'—এই ছড়াছত্রের মাধ্যমে।[৩৩] প্রবন্ধটি লোকভাষাবিজ্ঞান চর্চার একটি বৈজ্ঞানিক অগ্রবর্তী রচনা।

নির্মল দাশের উত্তরবঙ্গের নারীর ভাষা-বিষয়ক অনুসন্ধান বাংলা সমাজভাষা ও লোকভাষাচর্চার গুরুত্বপূর্ণ আরেক মাইলফলক। ১৯৭০ সালেই তিনি এমন অনুসন্ধান করেছিলেন ভাষাতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায়, তাঁর এই গবেষণার প্রেরণা ছিলেন খোদ সুকুমার সেন। পৃথিবীর সকল দেশে মেয়েদের মুখে ভাষায় লৌকিক রূপটি বিদ্যমান থাকে বলে সকল ভাষাবিজ্ঞানী মনে করে আসছেন। কেননা নারীদের মাধ্যমেই লোকসংস্কৃতির ধারাটি প্রধানত বাহিত হয় প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে। নির্মল দাশ

উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ নারীর মুখের ভাষা থেকে ওই ভাষার বিশেষত্ব খোঁজার চেষ্টা করেছেন বিচিত্র প্রক্রিয়ায়। নারীর ভাষার নানা লোকউপাদান বিশেষ করে সংস্কার ও ট্যাবুজনিত বাচন, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা ও ছড়ার প্রভূত ব্যবহার চিহ্নিত করেছেন যা লোকভাষাতাত্ত্বিক অনুষঙ্গকে প্রমাণ করে। বিশেষত মেয়েলি প্রবাদের ভাষা প্রসঙ্গে তাঁর নিরীক্ষণ হচ্ছে,

> উত্তরবঙ্গের নারীর ভাষার একটি বড়ো পরিচয় নিহিত আছে এ অঞ্চলের মেয়েলি প্রবাদবাক্যগুলোতে। [...] চলিত বাংলায় প্রবাদগুলির রূপান্তর করে দিলে সহৃদয় পাঠক সহজেই এদের রসবোধ, কৌতুকপ্রিয়তা, পরিহাসপটুতা, সামাজিক নিরীক্ষণভঙ্গি এবং সর্বোপরি এদের বাচনভঙ্গির একটা সংহত পরিচয় পাবেন।[৩৪]

এছাড়াও সুকুমার সেন তাঁর গবেষণায় মধ্য ও পূর্ববঙ্গের নারীর ভাষায় নারীর যে নিজস্ব শব্দভাণ্ডারের কথা বলেছিলেন, নির্মল দাশ উত্তরবঙ্গের নারীর ক্ষেত্রেও ওই একই বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছেন যা লোকজীবন আশ্রিত ও লোকসংস্কৃতি বাহিত।

ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক পশ্চিমবঙ্গের সমাজবিরোধীদের ভাষার ক্ষেত্রসমীক্ষা শুরু করেছিলেন ষাটের দশকরে সূচনালগ্ন থেকে। সমীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল হিসেবে সত্তরের দশকের প্রথমদিকে প্রকাশিত হয় তাঁর স্বতন্ত্র দুই গবেষণামূলক গ্রন্থ *অপরাধজগতের ভাষা* (১৯৭১) ও *অপরাধজগতের শব্দকোষ* (১৯৭১)। এই ধরনের ভাষাতাত্ত্বিক কাজ সমাজভাষার অন্তর্গত গোষ্ঠী-ভাষার আওতায় পড়ে। এই গোষ্ঠী আবার লোকসমাজ-ভিত্তিক বলে তাদের ভাষাও লোকভাষা। এছাড়া নিজেদের নানা বিশ্বাস, নিষেধ, লোকাচার, কুসংস্কার ইত্যাদিজাত ভাষা লোকভাষিক উপাদানে বিশিষ্ট। নিরক্ষর ও অসংস্কৃত সমাজের অপরাধীদের ভাষায় লৌকিক উচ্চারণ ভিন্ন ভঙ্গিতে বিশেষ রীতির হয়ে ওঠে। পতিতাদের লঘু ভাষায় ধ্বনিগত ও লোকায়ত নানা বিশেষত্বও বিদ্যমান। ভক্তিপ্রসাদের দৃষ্টিতে,

> পতিতাদের বাচনভঙ্গি কতক পরিমাণে সামাজিক অর্থনীতিক মানের ওপর নির্ভরশীল। একজন পতিতার বাচনভঙ্গি প্রকাশ করে তাদের সমাজে কোন স্তরে সে অবস্থান করছে। ধ্বনিবৈষম্য নির্ভর করে জন্মস্থানের ভাষা, সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা ইত্যাদি বহু কিছুর ওপর। এই শ্রেণির স্ত্রীলোকদের আচার-ব্যবহার এমনকি বাচনভঙ্গি বহুলাংশ তাদের পুরুষ অতিথি-অভ্যাগদের শ্রেণিসংস্কৃতি নির্ভর।[৩৫]

লোকভাষার বিশেষ রূপ হিসেবে পশ্চিমবাংলার অপরাধজগতের ভাষার সাংগঠনিক বিভিন্ন রূপ যেমন ধ্বনি, রূপমূল ও বাগর্থও বিশ্লেষণ করে ভাষাটির স্বতন্ত্রতা বিচার করেছেন ভক্তিপ্রসাদ। সব মিলিয়ে ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের সমাজভাষার বিশেষ গোষ্ঠীর ভাষা-বিশ্লেষণ হিসেবে *অপরাধজগতের ভাষা ও শব্দকোষ* লোকভাষাচর্চার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলা যায়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু তুলনামূলক ভাষাবিদ্যার কৃতী গবেষক ও অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৭৩ সালে ফোকলোরতত্ত্বমূলক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাঁর। *ভাষা* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল 'বাংলা খাবারের শব্দতাত্ত্বিক খবর'। নিঃসন্দেহে এটি লোকভাষাতাত্ত্বিক একটি বিশিষ্ট রচনা, লোকসংস্কৃতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে পশ্চিমবাংলার খাবার-দাবারের একটি শব্দার্থতাত্ত্বিক প্রতিবেদন তুলে ধরেছেন তিনি। লোকখাবারের নামের রহস্য, ব্যুৎপত্তি, শব্দরূপ, বাগর্থ প্রভৃতি ভাষাতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করে জনমানুষের রুচি, সৃষ্টিশীলতা ও আতিথেয়তাকে চমকপ্রদ ভাষায় তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। প্রবন্ধজুড়ে রয়েছে এরকম তথ্যবহুল বিদগ্ধ আলোচনা। খাবারের শব্দতাত্ত্বিক

বিষয়ে তাঁর কথা হচ্ছে, 'সব খাবারেই নামকরণ কখনও ইতিহাস জড়িত, কখনও উপাদানের নামনির্ভর, কখনও আকৃতি পরিচায়ক। আবার কখনও আলঙ্কারিক প্রসাধনপ্রাপ্ত।'[৩৬] প্রবন্ধটিতে লোকভাষার বাগর্থতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের বৈজ্ঞানিক প্রয়াস প্রতিফলিত।

সত্তরের দশকের শেষের থেকে রাজীব হুমায়ুন সমাজভাষা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। ১৯৭৭ সালে রচিত তাঁর গবেষণা-অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ছিল *Sociolinguistic and Descriptive analysis of Sandvipi, a Bangla Dialect*। আশির দশকের মাঝামাঝিতে সন্দ্বীপের ভাষার ওপর তাঁর বাংলাভাষায় লিখিত বইটি প্রকাশিত হয়। বইটিতে তিনি সন্দ্বীপের ভাষাকে সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে বিশ্লেষণ করলেও তার অনেক ক্ষেত্রে লোকভাষিক বিষয়ও সংশ্লিষ্ট ছিল। সন্দ্বীপ অঞ্চলের লোকভাষার বিভিন্ন সাংগঠনিক রূপের বিশ্লেষণ ছাড়াও লোকসংস্কৃতি ও লোকায়ত জীবনের নানা অনুষঙ্গ ভাষাটিকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে তারও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে নারীদের ভাষায় বিভিন্ন সামাজিক বিধি-নিষেধজনিত ট্যাবু, কণ্ঠস্বরের উচ্চতাজনিত ট্যাবু, পরপুরুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বাক্যালাপে ট্যাবু; লজ্জা বা সংস্কারজনিত কারণে বিশেষ শব্দ ও বিষয়ে সংকেতবদল, সুভাষণ ইত্যাদির উপস্থিতি লক্ষণীয়। লোকভাষার প্রধান যে বৈশিষ্ট্য স্থানীয়তা, লৌকিক পরিবেশ, লোকসমাজ ও সংস্কৃতিগত বিষয় সন্দ্বীপের ভাষায় সেসব উপাদানের উপস্থিতি ও বিশেষত্বও দেখানো হয়েছে। এভাবে গ্রন্থটিতে নানা লোকভাষিক তথ্য ও তত্ত্বের প্রতিফলন ও বিশ্লেষণ রয়েছে, যা লোকভাষা বিচারে গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলা লোকভাষাবিজ্ঞান চর্চার বিস্তারপর্ব

আশির দশকের শেষের দিকে সংস্কৃতি অধ্যয়ন বিদ্যার প্রভূত প্রসার হলে লোকসংস্কৃতি চর্চা উভয় বঙ্গে জনপ্রিয় হয়। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে লোকসংস্কৃতি গবেষণা-সংক্রান্ত বিদ্যায়তনিক পরিসর গড়ে ওঠে এবং বিভিন্ন চর্চাকেন্দ্রও স্থাপিত হয়। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ উল্লেখযোগ্য, যে-প্রতিষ্ঠানটি এ-সংক্রান্ত পত্রিকা প্রকাশের পাশাপাশি বিভিন্ন গবেষণা-গ্রন্থও প্রকাশ করতে থাকেন। লোকসংস্কৃতিচর্চার ধারায় তখন লোকভাষাচর্চাও দ্রুত গতিতে মান্যতা পায় এবং তখন থেকে লোকভাষাবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক কাঠামো বাংলা অঞ্চলে স্পষ্ট ও বিস্তৃত হতে থাকে। লোকভাষাচর্চায় এক্ষেত্রে প্রথমেই যে বিতর্ক উত্থাপিত হয় তা হলো খোদ লোকভাষার সংজ্ঞার্থ বা পরিভাষাটি নিয়ে। ১৯৮৯ সালে *লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকায়* (২:৩) প্রকাশিত হয় অমলেন্দুবিকাশ জানার 'ভাষা-উপভাষা-লোকভাষা' প্রবন্ধটি। নানা কারণে এটি গুরুত্বপূর্ণ যে আগে 'লোকভাষা' অর্থে অনেকেই উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষাটা বুঝতেন উভয় বাংলাতেই। এই প্রবন্ধে অমলেন্দুবিকাশ জানা যে 'সন্দর্ভ' তুলে ধরেন তাতে 'ভাষা' থেকে 'উপভাষা' এবং 'উপভাষা' থেকে 'লোকভাষা'কে পৃথক করে লোকভাষার চারিত্র্যধর্মকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেন। এখানে তাঁর জবানিতেই 'লোকভাষা'র ধারণা সংক্ষিপ্তভাবে নেয়া যেতে পারে,

> 'লোকভাষা' শব্দটিকে 'লোকমুখের ভাষা' এরকম ব্যাসবাক্যে শ্রেণিবদ্ধ করা যায়। বোধ করি এটাই এই শব্দার্থের একমাত্র প্রায়োগিক স্বরূপ। এই 'লোক' কারা জানা চাই। এরা হলেন প্রাকৃত বা সাধারণ মানুষ, যাঁরা জন্মগতভাবে ও পরিবেশসূত্রে প্রচলিত কথ্যভাষাকে মাতৃভাষাজ্ঞানে আয়ত্ত করেছেন সহজে। প্রচলিত এই

> কথ্যভাষাকে লোকভাষা বলা উচিত। এই লোকভাষাকে নিঃসন্দেহে আঞ্চলিক ভাষাও বলা যাবে। এই লোকভাষা গ্রাম ও শহরে পৃথক স্বরূপে পরিচিত ও বিকশিত। আমাদের বিচারে গ্রামকেন্দ্রিক আঞ্চলিক ভাষা এবং লোকভাষা মূলত একই বস্তু। শহুরে লোকভাষা ভাষার কেন্দ্রীয় আদর্শের অনুগামী, সেই হিসেবে সর্বজনমান্য [Standard] এবং নানা ভাষার মিশ্রণে অলঙ্কৃত।[৩৭]

একইসঙ্গে অমলেন্দুবিকাশ জানা লোকভাষার সঙ্গে লোকসাহিত্যের ভাষার সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য তুলে ধরে একটা তাত্ত্বিক দিক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। চিহ্নিত করেছেন লোকভাষার ঔপভাষিক লক্ষণ-সহ বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক মিশ্রণের স্বরূপ।

১৯৯০ সালে প্রকাশিত হয় আশিসকুমার দে-র 'লোকভাষা' প্রবন্ধটি। এতে তিনি শিষ্টভাষা, জনভাষা ও লোকভাষার পার্থক্য তুলে ধরে তাদের মধ্যেকার পার্থক্য এবং একই সঙ্গে লোকভাষার সঙ্গে উপভাষার পার্থক্য তুলে ধরে লোকভাষার বিশিষ্টতা ব্যাখ্যা করেন। তিনি লোকভাষাকে চিহ্নিত করেন তিনটি বৈশিষ্ট্য ধারা যথা—গ্রামীণতা, স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন ও ঐতিহ্যের প্রবহমানতা দ্বারা।[৩৮] একইসঙ্গে তিনি উপভাষা ও লোকসাহিত্যের ভাষা প্রসঙ্গে লোকভাষার সংযোগ ও দূরত্বকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। ১৯৯২ সালে প্রকাশিত আরও একটি প্রবন্ধ 'ভাষা-উপভাষা-লোকভাষা' প্রবন্ধে তিনি লোকভাষাকে সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করে নিজের লোকভাষাতাত্ত্বিক সন্দর্ভ তুলে ধরেছেন।

সুভাষচন্দ্র রায়চৌধুরীর 'লোকভাষা ও শৈলীবিজ্ঞান' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালে *লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকায়* (২:৩)। এটিও একটি তাত্ত্বিক ও প্রাগ্রসর রচনা। রচনাটিতে লেখক আধুনিক শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিভিন্ন লোকভাষা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ভিত্তিক লোকভাষার উচ্চারণরূপ, বাক্যরীতি, শব্দভাণ্ডার, প্রাসঙ্গিক বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রবণতা এবং সংশ্লিষ্ট ভাষাটির কালগত পরিবর্তনশীলতা বিশ্লেষণ করেছেন। লেখক লোকভাষার শৈলীগত মেজাজ পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে দেখেছেন ভিন্ন ভিন্ন সমাজের জীবনচর্যার পার্থক্য, সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার অনুসৃতিরক্ষার চেষ্টা লোকভাষা ব্যবহারকারীদের মনোজগতে অনেকটাই সক্রিয় থাকে। শব্দনির্বাচানের ভিন্নতার পেছনে এটি প্রাসঙ্গিক পটভূমি হিসেবে কাজ করে। লৌকিক সংস্কার, লোকবিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি অনেক সময় ট্যাবু শব্দের জন্ম দেয়। সুভাষচন্দ্র রায়চৌধুরীর বয়ানে শেষ কথা হচ্ছে,

> লোকভাষার প্রয়োগে বাক্যব্যবহারকারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা অনেকটাই স্বীকৃত। ধ্বনির উচ্চারণ, বাক্যের বিন্যাস, শব্দের প্রয়োগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে গোষ্ঠী ও সমাজের পার্থক্যজনিত প্রভাব লোকভাষার দেহে সুপরিস্ফুট হয়। এখানে কোনোও কিছুতেই সম্পূর্ণ ভুল বা বিকৃতভাবে বলে নির্দেশ করা সমীচীন নয়, যেহেতু একটি সর্বজনীন পরিকাঠামোরে দৃঢ় আঙ্গিক লোকভাষা কঠোরভাবে শৃঙ্খলিত থাকে না।[৩৯]

প্রবীণ ভাষাবিজ্ঞানী পরেশচন্দ্র মজুমদারও নতুন এই ভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাষাকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে আগ্রহী হন। ১৯৯০ সালে *লোকশ্রুতি* পত্রিকায় 'লোকভাষার স্বরূপ সন্ধানে'শীর্ষক তাঁর প্রবন্ধটি নিজের ধারণা নিয়ে প্রকাশিত হয়। ফার্দিনান্দ সোস্যুরের ভাষাবোধের বিভিন্ন তাত্ত্বিক স্তর ও সমাজভাষাবিজ্ঞানীদের তাত্ত্বিক সন্দর্ভের সমন্বয়ে লোকভাষাকে শিষ্ট, উপভাষা ও জনভাষা থেকে আলাদা করে তার বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করেছেন। একইসঙ্গে তিনি লোকভাষাকে

সমাজ-উপভাষার সঙ্গে সাঙ্গীকৃত করে তার তাত্ত্বিক বয়ান তুলে ধরে বাংলা লোকভাষাকে বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি ভাষাবিজ্ঞানী আইনার হগেনের আঞ্চলিক ভাষা থেকে শিষ্ট ভাষায় উত্তরণে চলমান প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যে চার মানদণ্ড সূত্রীভবন, বিশদীভবন, নির্বাচন ও স্বীকৃতি তার প্রয়োগে লোকভাষাকে বিচার করেছেন। এছাড়া লোকভাষাকে সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক দিক থেকে তাঁর যে অভিমত তা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে–

> বিভিন্ন কারণে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা উপজাতির মধ্যে লোকভাষা ধারাবাহিক সূত্রে জীবিত থাকে। এই ভাষা শহুরে সংস্কৃতির প্রভাবে অথবা মান্যভাষা/শিষ্ট ভাষার চাটে সাধারণত বিপর্যস্ত বা ক্ষীয়মাণ হয়ে পড়ে। তবু লোকভাষাভাষীদের সমাজ-আনুগত্য এবং গোষ্ঠীসত্তা তাতের জীবনবোধের সংহতিবলে (Solidarity) উচ্চতর সমাজের পরিশীলিত সামর্থ্যের (Power) বিরুদ্ধে প্রতিরোধও রচনা করে থাকে। সুতরাং লোকভাষার গোষ্ঠী-অনুভব (Community-feeling) যতটা ভাষিক ঐক্য গড়ে তোলে, তারচেয়ে বেশি গড়ে তোলে সামাজিক ঐক্য। আসলে লোকভাষার Unit ভাষাগত নয়, সমাজগত।[৪০]

লোকভাষার সঙ্গে লোকসাহিত্যের ভাষার সম্পর্ক-বিচার কিংবা লোকসাহিত্যে লোকভাষার ব্যবহার প্রসঙ্গে তাঁর মতামত হচ্ছে যে সবার আগে প্রয়োজন লোকসাহিত্যের ভাষার অন্তস্তলে যে লোক-অভিজ্ঞতা, সামাজিক প্রতিবেশ ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সঞ্চিত আছে তার পুনরুদ্‌ঘাটন করা। এক্ষেত্রে তাঁর কথা হচ্ছে, 'লোকসাহিত্য থেকে উদ্ধার করতে হবে লোকভাষার অন্তর্লীন গূঢ় ভগ্নাংশগুলিকে, আবিষ্কার করতে হবে লোকভাষার Unit-সমূহকে। লোকভাষার যদি বলি Motif বা অভিপ্রায়, তবে এই ভাষিক প্রকারগুলিকে বলতে হবে Folk-register বা লোকপ্রকরণ।'[৪১] সর্বোপরি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে লোকসাহিত্যের ভাষাতাত্ত্বিক অবয়ব এবং নির্মাণকৌশলে যেসব উপাদান ও প্রকরণ ব্যবহার করা হয় তার বিচারপূর্বক লোকসাহিত্যের ভাষায় লোকভাষার উপাদান নির্ণয়ের মানদণ্ড নির্ধারণের কথাও তিনি বলেন।

১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয় পবিত্র সরকারের 'লোকভাষা ও লৌকিক ভাষাতত্ত্ব' প্রবন্ধটি। এতে এ-যাবৎকালে 'লোকভাষা' পরিভাষাটি যে-অর্থে ব্যবহৃত হতো তার পরিবর্তে একে তিনি 'গ্রাম্যভাষা' পরিভাষায় উল্লেখ করেন এবং আরও কয়েক বছর পর আরেকটি প্রবন্ধে তা 'গ্রামভাষা' অভিধায় ব্যবহৃত হয়।[৪২] লোকভাষাকে তিনি বিশেষ গ্রামীণ অঞ্চলের ভাষা হিসেবে বিবেচনা না করে নাগরিক ভাষার সঙ্গে অর্থাৎ বাংলা মান ভাষার সঙ্গে বিরোধে যে-ভাষা গ্রাম্য বলে চিহ্নিত হয়, তাকেই তিনি লোকভাষা বলছেন।[৪৩] পবিত্র সরকার বাংলা গ্রাম্যভাষার চরিত্র নির্ধারণে মার্কিন গ্রাম্যভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছেন। এক্ষেত্রে জন স্যামুয়েল কেনিয়নের (১৮৭৪-১৯৫৯) ব্যবহারিক-সূত্রের পরিবর্তে লিওনার্দো ব্লুমফিল্ডের (১৮৮৭-১৯৪৯) রূপগত যে-দুই শ্রেণিবিভাগ 'গ্রাম্যভাষা' ও 'অ-মান্য ভাষা' তাদের প্রয়োগযোগ্য বলে মনে করেন। বাংলা গ্রাম্যভাষার চেহারা নির্ধারণে তিনি এদের ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক ও শব্দভাণ্ডারগত বৈশিষ্ট্যনিরূপণ করেছেন। শেষে মন্তব্য টেনেছেন যে, গ্রাম্যভাষা হবে অন্য যে কোনো উপভাষাভিত্তিক, তা ঢাকার গ্রামীণ উপভাষা এমনকি ঢাকার কুট্টিদেরও উপভাষা হতে পারে। অর্থাৎ যে-উপভাষা শহরের ভদ্র বা মার্জিত ভাষার সঙ্গে বিরোধভাবাপন্ন হবে এবং তা যদি বিশেষ মহলে গ্রাহ্য বা আদর্শরূপ হিসেবে বিবেচিত হয় তা হলে সেটা হবে ওই অঞ্চলের গ্রাম্যভাষা।।[৪৪] সর্বোপরি লোকভাষা বা গ্রাম্যভাষা বিষয়ে পবিত্র

সরকারের সারকথা হচ্ছে সাধারণের কাছে গ্রাম্যভাষার একটি আদর্শায়িত সাধারণী রূপ বা Stereotype তৈরি হয়ে যায়। ফলে আঞ্চলিক বা উপভাষা বা শ্রেণিবিশেষের ভাষা বা সমাজভাষা থেকে গ্রাম্যভাষাকে আলাদা করাটা জরুরি।

অন্যদিকে পবিত্র সরকার 'লৌকিক ভাষাতত্ত্ব' বলতে এমন কিছুকে বুঝিয়েছেন যার সঙ্গে গ্রাম্য বা লোকভাষার কোনো সম্পর্ক নেই। এক্ষেত্রে তিনি হেনরি হেনিগ্‌সোয়াল্ড-কৃত 'Folk-Linguistics' পরিভাষার বাংলা করেছেন 'লৌকিক ভাষাতত্ত্ব'। হেনিগ্‌সোয়াল্ডের belief about language-কথাটির সূত্র ধরে তিনি বলতে চান যে, এ ধরনের বিদ্যায় ভাষা বিষয়ে মানুষের বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা অপ্রামাণ্য বিষয়-আশয় চর্চিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ ভাষার বিজ্ঞানসম্মত চর্চার আগে ভাষাসংক্রান্ত মানুষ যে সব বিশ্বাস বা ধারণা পোষণ করে আসছে এবং এখনও কিছু কিছু মানুষ যুক্তিহীনভাবে ভাষা নিয়ে অলীক কিছু ভাবে তা নিয়েই লৌকিক ভাষাতত্ত্ব গড়ে উঠেছে। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে লৌকিক ভাষাতত্ত্বের মূল পার্থক্য হলো যুক্তির বিপরীতে বিশ্বাস।[৪৫]পবিত্র সরকারের এই ধারণার সঙ্গে ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক-সহ অপরাপরের ধারণা মেলে না।

লোকভাষা নিয়ে পবিত্র সরকারের অপর প্রবন্ধ 'বাংলা গালাগালের ভাষাতত্ত্ব'। এতে লোকসংস্কৃতির বিষয় যেমন আছে, তেমনি লোকভাষারও বিভিন্ন উপাদান রয়েছে। প্রবন্ধের প্রথমে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন গালাগাল ভাষা-নির্ভর নয়, সংস্কৃতি নির্ভর।[৪৬] তবে লোকভাষা কিংবা উপভাষা বা মান ভাষা সকল ভাষায় গালাগাল আছে। ভাষাভেদে এর রকমফের হয়ে থাকে। পবিত্র সরকারের মতে, 'যাকে অপভাষা বা Slang বলা হয় তা সাধারণত শিক্ষা ও রুচির দিক থেকে মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষের মুখেই বেশি শুনতে পাওয়া যায়।'[৪৭] গ্রামের মহিলাদের গালাগালে অভিসম্পাত-জাতীয় যে গালির উল্লেখ তিনি করেন তার সঙ্গে লোকবিশ্বাস সম্পৃক্ত বলে লোকভাষাতত্ত্বে এটি উল্লেখযোগ্য যোগ। এছাড়া নামের ধ্বনি-বিকৃতি করে যে-গালাগাল কিংবা প্রকৃতি, পরিবেশনির্ভর, কৃষিসংক্রান্ত ও ফলফসল-সংক্রান্ত যেসব গালি তা লোকভাষাকেই নির্ধারণ করে।

ভাষাবিজ্ঞানী মৃণাল নাথের 'ভাষা উপভাষা লোকভাষা' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালে। ইতোমধ্যে লোকভাষা নিয়ে যেসব আলাপ চলছিল এবং যেসব বিতর্কের উদ্ভব হয়েছিল প্রত্যক্ষভাবে তাতে তিনি শামিল হন। প্রথমত তিনি লোকভাষা বিষয়ে সেই মতটি খণ্ডন করেন যারা মনে করেন লোকভাষা হলো লোকসাহিত্যের ভাষা। এই মতের পক্ষে প্রধান হচ্ছে আশিসকুমার দে। মৃণাল নাথ ইউরোপীয় ও বঙ্গীয় লোকসাহিত্য থেকে উদাহরণ দিয়ে বলেন যে লোকসাহিত্যের ভাষামাত্রই লোকভাষা হতে পারে না। কেননা তাতে প্রচলিত ভাষাটি পরিমার্জিত আকারেই পরিবেশিত হয়। লোক হচ্ছে অধোবর্গীয় জন, সুতরাং তাদের ভাষা শিষ্ট হওয়ার প্রশ্নই আসে না। তাঁর মতে,

> মুদ্রিত লোকসাহিত্যের পুস্তক থেকে লোকসাহিত্যের ভাষার অনুসন্ধান করলে গবেষককে বিফল হতে হবে। 'লোক' সেখানে উপস্থিত থাকে বটে, ভদ্রলোকের হস্তক্ষেপে জনসমক্ষে হাজির করার জন্যই আসল 'ভাষা' (অনেক সময়) হারিয়ে যায়। সুতরাং মুদ্রিত লোকসাহিত্য বলতে আমরা যা পাই, সেই সাহিত্যের ভাষা লোকভাষা হতে পারে না। যদি লোক অর্থে আমরা শহরের অধোবর্গীয় এবং শহরের বাইরের লোকজনকে বুঝি।[৪৮]

এই যুক্তিতে লোকসাহিত্যের ভাষা লোকভাষা এমন সমীকরণকে তিনি বাস্তবসম্মত মনে করেন না।

লোকভাষা বিষয়ে দ্বিতীয় যে-বিতর্ক 'লোকভাষা' পরিভাষার পরিবর্তে 'গ্রাম্যভাষা'র সুপারিশ; যা প্রস্তাব করেছিলেন পবিত্র সরকার তার বিপক্ষে মত দেন মৃণাল নাথ। পবিত্র সরকারের অভিমত ছিল, যা নাগরিক বা শহুরে নয়, তা-ই গ্রাম্য অথবা যে বুলি শহুরে নয়, তা-ই গ্রাম্য বুলি বা গ্রাম্য ভাষা।[৪৯] এ-প্রসঙ্গে মৃণাল নাথের কথা হচ্ছে শহরের যাবতীয় কিছুই শহুরে বা নাগরিক নয়, শহরেও অধোবর্গীয় লোক থাকে। তাদের ভাষা বা সংস্কৃতি শহুরে নয়, নাগরিকও নয়। বরং তা অ-নাগরিক; অশিষ্ট ও অমান্য। আবার লোকভাষার সংজ্ঞার্থ দিতে গিয়ে যেটা বলেন পবিত্র সরকার এমন সিদ্ধান্তে আপত্তি করেন না মৃণাল নাথ যে—যদি তার অর্থ এই হয় যে শহরের মান্যভাষার অবস্থান একদিকে আর যাবতীয় অমান্য বুলির অবস্থান অন্যদিকে; অ-মান্য এবং মান্য বিরোধ যদি তিনি বুঝিয়ে থাকেন, এবং অ-মান্য বুলিই হবে লোকভাষা। মৃণাল নাথ পবিত্র সরকারের মুখে এই 'গ্রাম্য' শব্দটি একেবারেই আশা করেননি, অন্যত্র যেখানে তিনি (পবিত্র সরকার) বলছেন, 'ভাষায় শহরের লোক গ্রামীণতার যে লক্ষণগুলো চিহ্নিত করে তা হলো লোকভাষা'[৫০] তাও মৃণাল নাথকে দ্বিধান্বিত করে দেয়। বরং শহরের লোকদের ভাষা-সম্পর্কিত এমন ধারণাকে তিনি 'লৌকিক ভাষাতত্ত্ব' নামে চিহ্নিত করতে চান। পবিত্র সরকার অন্যত্র আবার বলছেন যে গ্রাম্যভাষা কোনো নির্দিষ্ট উপভাষা নয়, তা বিভিন্ন উপভাষার গ্রাম্যতা বা অনাগরিকত্বের বিচিত্র লক্ষণের একটি সরলীকৃত সমাবেশমাত্র।[৫১] এর জবাবে মৃণাল নাথের কথা হচ্ছে বিষয়টি যদি পবিত্র সরকার নিন্দর্থে না-বলে থাকেন তাহলে উপভাষা ও গ্রাম্যতার মধ্যেও কোনো বিরোধ নেই, আঞ্চলিক জীবন গ্রামভিত্তিক বলে উপভাষা-মাত্রেই গ্রাম্য এবং নিশ্চিতভাবেই অ-নাগরিক। এছাড়া পশ্চিমবাংলায় লোকভাষা বা গ্রাম্যভাষা বলতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা অঞ্চলের উপভাষাভিত্তিক যে আদর্শায়িত রূপকে উদাহরণ হিসেবে হাজির করেছেন পবিত্র সরকার তাতেও তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। বরং মৃণাল নাথ পবিত্র সরকারের বক্তব্যের মধ্যে একটা স্ববিরোধও খুঁজে পান অর্থাৎ তাঁর একটি মন্তব্য গ্রহণ করলে অপরটি বাতিল করতে হয়। এছাড়া পবিত্র সরকার 'Substandard ভাষারূপের সঙ্গে গ্রাম্য ভাষার সাদৃশ্য বেশি' বলে যে মন্তব্য করেছিলেন মৃণাল নাথ তারও বিরোধিতা করেন। এর জবাবে সমকালীন সমাজভাষাবিজ্ঞানী জন রবার্ট এডোয়ার্ডসের (১৯৪৭) বরাত দিয়ে তিনি জানান যে, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান ভাষার মধ্যে অধোমান্য বলে কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করে না। মৃণাল নাথ যুক্তি দেখান যে, "শহরে কেবল নাগরিক উপভাষার অস্তিত্বই থাকে না, সেখানেও আছে অধোবর্গীয় জন, তাদের বুলিও 'গ্রাম্য' ভাষার অন্তর্গত। শহরে থেকেই তারা অ-নাগরিক; শহরে থাকলেও বুলি অমান্য (Non-standard), কিন্তু তা কখনই অধোমান্য (Sub-standard) নয়।"[৫২]

তর্কমূলক প্রবন্ধটির শেষে এসে মৃণাল নাথ ভাষা-উপভাষা-লোকভাষা নিয়ে নিজের মতকে স্পষ্ট করে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, অন্তত গ্রাম্যভাষার পরিবর্তে 'লোকভাষা' পরিভাষাকে বেছে নিয়ে তার এ-বিষয়ে সিদ্ধান্তও উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে, আঞ্চলিক বুলিমাত্রেই 'অ-মান্য', আর তা 'অধোমান্য' হওয়ার কথাই আসে না। সামাজিক স্তরবিন্যাসজনিত কারণে আঞ্চলিক বুলিতে রকমফের থাকলেও, তার সমস্ত স্তরের ভাষায় আঞ্চলিকতাই বজায় থাকে। তাই আঞ্চলিক উপভাষা

ও লোকভাষা প্রশ্নে তুলনামূলক বিচার করে লোকভাষাকে তিনি নিম্নভাবে চিহ্নিত ও সংজ্ঞায়িত করেছেন যে,

> আঞ্চলিক তথা অ-মান্য উপভাষার আরেক নাম লোকভাষা, কারণ 'লোক'-এর অস্তিত্ব মান্য অ-মান্য ভাষায় নয়, সাহিত্যে বা কিছু নাটকের চরিত্রের মুখের ভাষায়ও নয়, এমনকি লোকসাহিত্যের ভাষাও লব্ধ নয়। সবই কিন্তু শহরে মানসিকতার কৃত্রিম পরিবেশন। সেখানে 'লোক'ও নেই, তার 'ভাষা'ও নেই। লোকভাষাকে খুঁজতে হলে যেতে হবে অ-মান্য পরিবেশে, অ-নাগরিক অবস্থানে, সেখানে 'লোক'ও থাকবে, 'ভাষা'ও থাকবে। তা-ই হবে আসল 'লোকভাষা'।[৫৩]

লোকভাষা নিয়ে পবিত্র সরকার ও মৃণাল নাথের এই বাহাস লোকভাষা চর্চায় বেশ প্রভাব ফেলে, ফলে তরুণরাও নতুন ধারণা নিয়ে লোকভাষা চর্চায় বৃত হয়ে এ-সংক্রান্ত চর্চা অব্যাহত রাখেন। ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয় শমিক রায়ের 'লোকভাষা—কোন্ ভাষা?' প্রবন্ধটি। একই বছরে প্রকাশিত হয় অরুণ ঘোষের 'প্রসঙ্গ : লোকভাষা' প্রবন্ধ। প্রকাশিত হয় সনৎকুমার মিত্রের 'লোকসাহিত্য ও লোকভাষা : সংযোগ সমস্যা' ও অনিমেষকান্তি পালের 'বাংলার সাংস্কৃতিক ও ঔপভাষিক ভূগোল'। এসব প্রবন্ধে যেমন লোকভাষার বিচিত্র অনুষঙ্গ আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে, একই সঙ্গে লেখকদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে ঐকমত্যও দেখা যায় না। নতুন বিদ্যাচর্চায় এমনটা হয়তো স্বাভাবিক। ১৯৯৩ সালেই পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি পরিষদ *লোকভাষা* নামে একটি প্রবন্ধ-সংকলন প্রকাশ করে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। এতে আট জন ভাষাচর্চাকারীর মতামত সংবলিত প্রবন্ধ স্থান পায়। লোকভাষাচর্চায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকলন-গ্রন্থ হিসেবে পরিচিতি পায়।

লোকসংস্কৃতিচর্চার ধারা থেকে প্রতীয়মান হয় লোকভাষাচর্চার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের তুলনায় পশ্চিমবাংলার ভাষাবিজ্ঞানী ও গবেষকরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। যদিও লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সত্তরের দশক থেকে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে এসেছিল। নতুন এই বিদ্যার অস্পষ্টতা ও বিতর্কের দরুণ বাংলাদেশে তো নয়ই, পশ্চিমবাংলায়ও অনেকে একে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র ডিসিপ্লিন তো দূরের কথা ছাত্রপাঠ্য করতে চাননি।[৫৪] তবে ১৯৮৭ সালে পশ্চিমবাংলার বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি' বিষয়ক সেমিনারে লোকভাষা নিয়ে প্রথম একাডেমিক কথাবার্তা শুরু হয়েছিল। আরও পরে ২০০১ সালে পশ্চিমবাংলার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতি বিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদের একটি সেমিনারের আয়োজন লোকভাষাবিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। সেমিনারে প্রবন্ধ পাঠ করেন পবিত্র সরকার, নির্মল দাশ, রামেশ্বর শ' ও উদয়কুমার চক্রবর্তী। একই বছরে পরিষদ সনৎকুমার মিত্রের সম্পাদনায় *বাঙলা লোকভাষা বিজ্ঞান* নামে একটি প্রবন্ধ-সংকলন প্রকাশ করে ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখে। পূর্বোক্ত চার অধ্যাপক-ভাষাবিজ্ঞানীর পঠিত প্রবন্ধগুলো মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয় সংকলনে। প্রবন্ধগুলো হচ্ছে যথাক্রমে 'লোকভাষা ও গ্রামভাষা', 'লোকভাষা', 'লোকভাষা : স্বরূপ ও বিশ্লেষণ' ও 'ঢাকার লোককাহিনী : মৌলিক ধারা অনুসন্ধান'। এছাড়া সংকলনটিতে অভিজিৎ মজুমদারের উত্তরাধিকার সূত্রে ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে পাঠ নিয়ে "*লিপিকা*-র 'কর্তার ভূত' : লোকভাষার প্রয়োগতত্ত্ব" ও পল্লব সেনগুপ্তের নতুনমাত্রার প্রবন্ধ 'লৌকিক গালমন্দ : সমাজ-মনস্ততত্ত্ব ও রূপতত্ত্ব' প্রবন্ধ-দুটিও স্থান পায়। তবে তখন পর্যন্ত গবেষক, লেখক,

ফোকলোরবিদ ও ভাষাবিজ্ঞানীরা 'লোকভাষা' ও 'লোকভাষাবিজ্ঞান' বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না।

উপসংহার

'বাংলা লোকভাষাবিজ্ঞান-চর্চার প্রেক্ষাপট, ইতিহাস ও প্রবণতা'-শীর্ষক উপর্যুক্ত গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল হিসেবে প্রথমত দেখা গেছে যে সিভিলিয়ানদের ভাষাশিক্ষা, ব্যাকরণ রচনা, বিভিন্ন উপভাষার নমুনা সংগ্রহ, শব্দসংগ্রহ, অভিধান রচনা প্রভৃতি ভাষাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান-সংগ্রহ-গবেষণায় বিভিন্ন আঞ্চলিক ও লৌকিক অনুষঙ্গ কার্যকরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। উনিশশতকের মাঝামাঝিতে গদ্যসাহিত্যের ভাষার প্রশ্নে যে-ভাষাতাত্ত্বিক বিতর্ক আসে তাতেও লৌকিক উপাদান নানাভাবে গণ্য হয়। ভাষার মান্যতার আলোচনায় গ্রাম-শহর, উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্ত, শ্লীল-অশ্লীল, নারী-পুরুষ, অভিজাত-অনভিজাত ইত্যাদি সমাজতাত্ত্বিক ও লৌকিক দিকও বিবেচনায় আসে। এমনকি উনিশশতকের শেষার্ধ থেকে চলমান সাধু ও চলিত ভাষা-বিতর্ক, জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় বাংলা পরিভাষা-চিন্তা, হিন্দু-মুসলমান-সহ সমাজের নানা শ্রেণির ভাষাভেদ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ভাষার আঞ্চলিকতা, গ্রামীণতা, অমার্জিত রূপ উঠে এসেছিল যা লোকভাষাবিজ্ঞানের বিষয়। এছাড়া বিশ শতকে বাংলার উপভাষা নিয়ে জর্জ গ্রিয়ার্সনের সমীক্ষার পর বাঙালিদের মধ্যে উপভাষাচর্চার যে ধারা সূচিত হয় সে পথ ধরে আঞ্চলিক ও গ্রামীণ ভাষার যে চর্চা তাও লোকভাষা অনুশীলনের পর্যায়ে পড়ে। সুকুমার সেন নারীর ভাষার যে-বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন তাও লোকভাষাবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত। এভাবে বিশশতকের সত্তরের দশকের সূচনালগ্নে সুকুমার সেন, ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, নির্মল দাশ প্রমুখের প্রবন্ধের পূর্বপর্যন্ত রচিত বিভিন্ন সংকলন ও প্রবন্ধে লোকভাষাবৈজ্ঞানিক অনুষঙ্গ ও উপাদান পরিলক্ষিত হয়। তখন পর্যন্ত লোকভাষাবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গড়ে ওঠেনি কিংবা এই অঞ্চলে বিদ্যাচর্চায় তা পরিচিতি পায়নি। এমনটা হওয়ার সুযোগও ছিল না। সত্তরের দশকের গোড়া থেকে প্রথমে পশ্চিম বাংলায় ও পরে বাংলাদেশে সমাজভাষাবিজ্ঞানের সূত্রে প্রথাগত ব্যাকরণ ও সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ঐতিহ্যের পথ ধরেই লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি অনুষঙ্গে লোকভাষাবিজ্ঞান চর্চা শুরু হয়। সেদিক থেকে ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, সুকুমার সেন, নির্মল দাশ ও দীনেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখের রচনা লোকভাষাবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত প্রথম দিকের তত্ত্বীয় রচনা। এরপর একে একে লৌকিক ভাষার বিশ্লেষণ, লোকসাহিত্যের ভাষা অনুসন্ধান, লৌকিক সংস্কৃতির সঙ্গে লোকসমাজের ভাষার সম্পর্ক, গালাগালের ভাষা ইত্যাদি তাত্ত্বিকভাবে চর্চিত হতে থাকে। আশির দশকের শেষের দিক থেকে নব্বইয়ের দশক পেরিয়ে নতুন শতকের প্রথম বছর পর্যন্ত ভাষাবৈজ্ঞানিক চর্চা ছাড়াও তত্ত্বগত আলোচনা ও রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। এতে জনসংস্কৃতি ও জনমনস্তত্ত্বের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক, ভাষাপ্রয়োগবাদ ও লোকভাষা, ঔপভাষিক ভূগোল ও লোকভাষা, লোকভাষা ও লোকসাহিত্যের সংযোগ সমস্যা প্রভৃতি অত্যাধুনিক অনুষঙ্গও বিশ্লেষিত হতে থাকে। তবে এটাও ঠিক যে, ২০০১ সালের গবেষণার সময়সীমা পর্যন্তও লোকভাষা বা লৌকিক ভাষাতত্ত্ব বা লোকভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে তাত্ত্বিকেরা সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। তাই বলে চর্চা থেমে থাকেনি, বরং বহুমাত্রিক অভিক্ষেপ চলমান থাকে।

দ্বিতীয়ত, বাংলা অঞ্চলের ভাষাবিজ্ঞানী ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গবেষক ছাড়াও বিভিন্ন বিদ্বান ব্যক্তিও লোকভাষা নিয়ে চর্চা করেছেন। এমনকি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উচ্চশিক্ষিত নন এমন ব্যক্তিরাও রয়েছেন যারা একাজে এগিয়ে এসেছেন। তবে এদের বেশিরভাগই উপভাষা বা আঞ্চলিকভাষা অর্থে লোকভাষা চর্চা করেছেন। অনেকে আবার উপভাষা ও লোকভাষাকে সমার্থক ভেবে কাজটি করেছেন। এমনকি তারা উপভাষা শব্দটি ব্যবহার না করে লোকভাষা শব্দের ব্যবহার করেছেন। লেখকদের রচনা সূচিতে প্রতীয়মান হয় যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাত্ত্বিক পদ্ধতি মানা হয়নি, তবে এটা স্বাভাবিক যে বিদ্যাটির তাত্ত্বিক দিকের উন্মোচন হয়েছিল বেশিদিন আগে নয়। তবে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান চর্চা করেন কিংবা সংস্কৃতি অধ্যয়ন বিদ্যার সঙ্গে যুক্ত কিংবা লোকসংস্কৃতি ও ফোকলোর তত্ত্ব নিয়ে কাজ করেন এমন সব একাডেমিক ব্যক্তির রচনায় লোকভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। এছাড়া দেখা যায় লোকভাষার ভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনার বাইরে অ-ভাষাতাত্ত্বিক এমন অনেক দিক আছে যাতে লেখকেরা সচেতন ছিলেন; লোকভাষার অন্তর্বস্তু হিসেবে সেসবের উন্মোচন এসব রচনার শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ দিক। এছাড়া বিভিন্ন তত্ত্ব-পদ্ধতিতে বাংলা ছাড়াও ইংরেজি ভাষায় লোকভাষাবৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি এরূপ বিদ্যাচর্চার গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।

বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সহ বাংলাভাষী অঞ্চলসমূহে লোকভাষাবিজ্ঞানের মতো আধুনিততম বিদ্যাচর্চা যে যথেষ্ট ও মানসম্পন্নভাবে সাধিত হয়েছে এমনটা বলা যায় না। তবে উভয় অঞ্চলে এটি একটি বিকাশমান ধারা। অন্তত নতুন শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত চর্চার ইতিহাস পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয় যে, লোকভাষাবিজ্ঞানের সূক্ষ্মতর বিষয় ও পদ্ধতি এখনো ততটা প্রযুক্ত হতে দেখা যায়নি। লোকভাষাবৈজ্ঞানিক অনেক সমস্যামূলক বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন ও চর্চা শুরুই হয়নি। এজন্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট-বিদ্যার অধিভুক্তিগত সমস্যা, সংশ্লিষ্ট বিদ্যায় গ্রাজুয়েট-গবেষক ও শিক্ষকের অভাব, গবেষণায় প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধার অপ্রতুলতা, প্রকাশনার ক্ষেত্রে পরিসরের অভাব প্রভৃতি দায়ী। সারা পৃথিবীর সঙ্গে জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ, লোকসংস্কৃতি ও ভাষার পারিস্পরিক সম্পর্ক অনুসন্ধান, বুলিভাণ্ডারের বিচিত্রতা অনুধাবন, ভাষার গ্রামীণ রূপ চিহ্নায়ন, স্থানীয় ও স্বতন্ত্রের চিহ্ন নির্ধারণ এবং ভাষায় লোকজীবন তথা ঐতিহ্যের প্রবহমানতা আবিষ্কার ও সুরক্ষা প্রভৃতি কারণে লোকভাষাবিজ্ঞান অধ্যয়ন ও চর্চা পরিবর্তনশীল বিশ্বপরিস্থিতিতে খুর জরুরি। আর এর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন ।

তথ্যনির্দেশ

১ পবিত্র সরকার, 'লোকভাষা ও লৌকিক ভাষাতত্ত্ব', *লোকভাষা লোকসংস্কৃতি*, কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৯১, পৃ. ১৪৮

২ Henry M. Hoenigswalt, `A proposal for the study of Folk Linguistics', *Sociolinguistics*, Eds.: William Bright, The Hague & Paris: Monton & Co., 1971, pp. 16-27

৩ উদ্ধৃত : পরেশচন্দ্র মজুমদার (২০০১), 'লোকভাষার স্বরূপ সন্ধানে', *বাঙলা লোকভাষাবিজ্ঞান*, সম্পা: সনৎকুমার মিত্র, কলকাতা : লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পৃ. ৬

৪ পবিত্র সরকার, প্রাগুক্ত, ১৯৯১, পৃ. ১৪৯

৫ সুকুমার সেন, 'লোক-সাহিত্যের ভাষা', *বাঙালির ভাষাচিন্তা*, সম্পাঃ সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতাঃ প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০২, পৃ. ১৬৬

৬ পবিত্র সরকার, 'শতাব্দীর বাঙলা ভাষাচর্চা', *বাঙালীর বাঙলাভাষা চিন্তা*, সম্পাঃ মনসুর মুসা, ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইট অব বাংলাদেশ, ১৯৯৪ পৃ. ২৬

৭ প্রাগুক্ত

৮ দ্রষ্টব্যঃ Assupc.am, Manoel Da, *Vocabulario Em Idiom Bengalla, E Portiguez,* Dividido e duas partes, 1743, Lisbona

৯ দ্রষ্টব্যঃ Nathaniel Brassy Halhed, *A Grammer of the Bengali Language*, (Hooghly: Unnabridges fasimile edition 1980), 1778

১০ দ্রষ্টব্যঃ Henry Pitts Forster, *A Vocabulary in two parts, English and Bongalee, and vice versa*. Part 1: English and Bengali. Calcutta, 1799, এবং *A Vocabulary in two parts, English and Bongalee, and vice versa. Part 2: Bengali and English*, Calcutta, 1802

১১ উদ্ধৃত : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৫ম খণ্ড)*, কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সি প্র. লি., ১৯৮৫, পৃ. ২৬৭

১২ সত্রাজিৎ গোস্বামী, *বাংলা অকথ্যভাষা ও শব্দকোষ*, কলকাতা : একবিংশ, ২০০১, পৃ. ২২

১৩ উইলিয়াম কেরি, *কথোপকথন*, [প্রথম প্রকাশ : শ্রীরামপুর প্রেস] *পুরাতন বাংলা গদ্য সংকলন*, সম্পাঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৩, পৃ. ২০২-২৩৮

১৪ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, 'আলালের ঘরের দুলাল', *বিবিধার্থসংগ্রহ* (মে-জুন সংখ্যা), কলকাতা; দ্রষ্টব্য : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গং সম্পাদিত *আলালের ঘরের দুলাল*-এর ভূমিকা, ১৯৫৮, পৃ. ৭

১৫ জ্ঞানেন্দ্রমোহন বসু, 'বাঙ্গালা শব্দতত্ত্ব', *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, খণ্ড ৮(১), কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯০১, পৃ. ২৮-২৯

১৬ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ', *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, খণ্ড ৮(৪), কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩০৮, পৃ. ১২০

১৭ দ্রষ্টব্যঃ Grierson, George Abraham, *Linguistics Survey of India*: *Specimens of the Bengali and Assamese Languages* (Vol. 5, Part 1), Kalkata: GOI Publications Branch, 1903

১৮ রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার, 'ময়মনসিংহের গ্রাম্যভাষা', *বাঙলায় সমাজভাষাচর্চা*, প্রথম প্রকাশ : ১৯০৫, সম্পাঃ সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা : নির্ঝর, ২০২২, পৃ. ১০১-১০২

১৯ যোগেশচন্দ্র রায়, 'রাঢ়ের কথিত ভাষা' [প্রথম প্রকাশ : ১৯১২], *বাঙলায় সমাজভাষাচর্চা*, সম্পাঃ সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা : নির্ঝর, ২০২২, পৃ. ৫৯

২০ হেমন্তকুমার সরকার, 'ছোটোলোকের ভাষা' [প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৫], *বাঙলায় সমাজভাষাচর্চা*, সম্পাঃ সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা : নির্ঝর, ২০২২, পৃ. ১১৪

২১ বেগম জাহার আরা, 'বাঙালীর উপভাষা চিন্তা', সম্পাঃ মনসুর মুসা, ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইট অব বাংলাদেশ, ১৯৯৪, পৃ. ১৬১

২২ দ্রষ্টব্য : নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 'খুলনা জেলার মাঝির ভাষা' [প্রথম প্রকাশ : ১৯২৪], *বাঙলায় সমাজভাষাচর্চা*, সম্পাঃ সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা : নির্ঝর, ২০২২

২৩ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা* [প্রথম প্রকাশ ১৯২৯], কলিকাতা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬, পৃ. ৫৩

২৪ দ্রষ্টব্যঃ সুকুমার সেন, 'বাংলায় নারীর ভাষা', উদ্ধৃত, হুমায়ুন আজাদ (২০০১), *বাংলা ভাষা*, ২য় খণ্ড, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯২৯, পৃ. ৫৮৮-৫৯৫

২৫ দীনেশচন্দ্র সেন, *বাংলার পুরনারী* (প্রথম প্রকাশ ১৯৩৯), সম্পা. : রঞ্জিত সেন, কলকাতা : অরুণা প্রকাশন, ২০১১, পৃ. ভূমিকাঃ তিপ্পান্ন

২৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ভূমিকাঃ চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন

২৭ অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দক্ষিণ-বঙ্গের কথ্য ভাষা' [প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৩], 'ময়মনসিংহের গ্রাম্যভাষা', *বাঙলায় সমাজভাষাচর্চা*, কলকাতা : নির্ঝর, ২০২২, পৃ. ১০০

২৮ চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, 'নদীয়ার ভাষা' [প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৫], *বাঙলায় সমাজভাষাচর্চা*, সম্পা. : সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা : নির্ঝর, ২০২২, পৃ. ১০৮

২৯ সুকুমার সেন, 'বর্ধমানের মুচিদের ভাষা' [প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৫], *বাঙলায় সমাজভাষাচর্চা*, সম্পা. : সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা : নির্ঝর, ২০২২, পৃ. ১১১

৩০ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'ভূমিকা : ধ', *বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান* (১ম খণ্ড), ঢাকা : বাংলা একাডেমী;, ১৯৭৩, পৃ. ভূমিকা : ধ

৩১ ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, 'লৌকিক ভাষা', *বাঙালির ভাষাচিন্তা*, সম্পাঃ সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতাঃ প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০২, পৃ. ১৭৭

৩২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

৩৩ দ্রষ্টব্যঃ সুকুমার সেন, 'লোক-সাহিত্যের ভাষা', সম্পাঃ সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতাঃ প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০২, পৃ. ১৭১;

৩৪ নির্মল দাশ, 'উত্তরবঙ্গের নারীর ভাষা' (প্রথম প্রকাশ : ১৯৭০), *বাঙালির ভাষাচিন্তা*, সম্পাঃ সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতাঃ প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০২, পৃ. ১৮৭

৩৫ ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, *অপরাধজগতের ভাষা ও শব্দকোষ*, কলকাতা : দেজ পাবলিশিং, ১৯৯৩, পৃ. ৭৬

৩৬ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, 'বাংলা খাবারের শব্দতাত্ত্বিক খবর' [প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৩], *বাঙালির ভাষাচিন্তা*, সম্পা.: সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতাঃ প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০২, পৃ. ১৪৪

৩৭ অমলেন্দুবিকাশ জানা, 'ভাষা-উপভাষা-লোকভাষা' [প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৯], *লোকভাষা*, সম্পা. : আশিসকুমার দে ও সনৎকুমার মিত্র, কলকাতাঃ লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, ১৯৯৩, পৃ. ২৮-২৯

৩৮ আশিসকুমার দে, 'লোকভাষা' [প্রথম প্রকাশ : ১৯৯০], *লোকভাষা*, সম্পা. : আশিসকুমার দে ও সনৎকুমার মিত্র, কলকাতা : লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, ১৯৯৩, পৃ. ৬৬

৩৯ সুভাষচন্দ্র রায়চৌধুরী, 'লোকভাষা ও শৈলীবিজ্ঞান' [প্রথম প্রকাশ : ১৯৯০], *বাঙলা লোকভাষাবিজ্ঞান*, সম্পা : সনৎকুমার মিত্র, কলকাতা : লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, ২০০১, পৃ. ১১২

৪০ পরেশচন্দ্র মজুমদার, 'লোকভাষার স্বরূপ সন্ধানে' [প্রথম প্রকাশ ১৯৯০], *লোকভাষা*, সম্পাঃ আশিসকুমার দে ও সনৎকুমার মিত্র, কলকাতাঃ লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, ১৯৯৩, পৃ. ১৪

৪১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

৪২ দ্রষ্টব্যঃ পবিত্র সরকার, 'লোকভাষা ও লৌকিক ভাষাতত্ত্ব', *লোকভাষা লোকসংস্কৃতি*, কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন এবং (২০০১), 'লোকভাষা ও গ্রামভাষা', *বাঙলা লোকভাষাবিজ্ঞান*, সম্পা : সনৎকুমার মিত্র, কলকাতা : লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, ১৯৯১

৪৩ পবিত্র সরকার, 'লোকভাষা ও লৌকিক ভাষাতত্ত্ব', *লোকভাষা লোকসংস্কৃতি*, কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৯১, পৃ. ১৪৮-১৪৯

৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

৪৫ প্রাগুক্ত

৪৬ পবিত্র সরকার, 'বাংলা গালাগালের ভাষাতত্ত্ব', *লোকভাষা লোকসংস্কৃতি*, কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৯১, পৃ. ১০৮

৪৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

৪৮ মৃণাল নাথ, 'ভাষা উপভাষা লোকভাষা', *প্রসঙ্গ : ভাষাতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞান*, কলকাতা : অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯২, পৃ. ৭১

৪৯ উদ্ধৃতঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

৫০ প্রাগুক্ত

৫১ প্রাগুক্ত

৫২ মৃণাল নাথ, 'ভাষা উপভাষা লোকভাষা', *প্রসঙ্গঃ ভাষাতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞান*, সম্পা : সমীরণ মজুমদার, কলকাতা : অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯২, পৃ. ৭২-৭৩

৫৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

৫৪ আশিসকুমার দে ও সনৎকুমার মিত্র, 'ভূমিকা', *লোকভাষা*, সম্পা : আশিসকুমার দে ও সনৎকুমার মিত্র, কলকাতাঃ লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, ১৯৯৩, পৃ. ভূমিকা : ছয়